QUEST

A Multidisciplinary Bilingual Peer-Reviewed Academic Journal

"The key idea in chemistry is that when one substance changes into another, the atoms themselves do not change: they simply exchange partners or enter Into new arrangements. Chemistry is all about divorce and remarriage."

A Very Short Introduction to Chemistry
by
Peter Atkins.

ISSN 2319-2151

Uluberia College
Uluberia, Howrah
Pin: 711 315

QUEST

ISSN: 2319-2151
Volume – 15 & 16

Uluberia College

QUEST

A Multidisciplinary Bilingual Peer-Reviewed Academic Journal

Volume: 15 & 16
2020-21 & 2021-22
(combined)

Editors

Dr. Subhamay Ghosh
Dr. Ratna Bandyopadhyay

Editorial Board

Dr. Jayashree Sarkar, Dr. Tuhina Sarkar, Dr. Momotaj Begam,
Dr. Abdullah Bin Rahman, Dr. Biswajit Saha, Dr. Kamalesh Das,
Dr. Arup Kumar Sarkar, Dr. Basabdatta Ghosh, Dr. Sk. Ibrahim

Advisory Committee

Dr. Debasish Pal (Principal)
Dr. Shibsankar Das
Dr. Siddhartha Shankar Bhattacharya
Dr. Tapas kumar Samanta
Dr. Basanti Bhattacharya
Smt. Supti Ghata
Smt. Kasturi Saha
Sri Rakesh Ghosh
Sri Sandip Dolui

An Uluberia College Initiative

QUEST
A Multidisciplinary Bilingual
Peer-Reviewed Academic Journal

Volume: 15 & 16
2020-21 & 2021-22
February, 2022

Cover designed by : Dr. Subhamay Ghosh

Illustrations : Sri Souvik Patra

Printed by :
IMPRESSION
108, Raja Basanta Roy Road,
Kolkata 700 029
Mobile: 9831455695

QUEST

A Multidisciplinary Bilingual Peer-Reviewed Academic Journal

2020-21 & 2021-22
(Combined)

Volume – 15 & 16

Uluberia College
Uluberia, Howrah
PIN: 711315

From the Editors' Desk

We are delighted to bring forth the current issue of our Multidisciplinary Bilingual Peer-Reviewed Academic Journal, Quest (ISSN 2319 2151). This issue honours the birth anniversaries of two of the meliorists, society benefited from; Ishwar Chandra Vidyasagar and Satyajit Ray.

Reflecting on the past, it is evident that human civilization was on the brink of losing an entire generation due to the devastating impact of COVID-19. Such was the devastation created by the effect of COVID -19 over nearly two years. The future of billions of people round the world was at risk. Major countries including ours tried tirelessly to find the remedies for the effects of the interruption in every important aspect of our lives; health care, education, economy. Most alarming was the prolonged interruption in learning, the deleterious effect of which has a deep impact. We struggle to re-establish our normalcy and often fail, but we must uphold faith in ourselves.

The current edition of 'Quest' is therefore being published, much late than its usual time. The two editions, the previous (2020-2021) and the current (2021-2022) have been merged together into a single one. On behalf of the editorial board, we extend our gratitude to all distinguished faculty members both within and beyond our institution who have enriched the journal with their contributions. This special issue of 'Quest' is a tribute to the bicentenary birth anniversary of Pandit Iswar Chandra Vidyasagar (1820-1891) and the birth centenary of Satyajit Ray (1921-1992). The 'Special Attraction' section of this issue seeks to explore their lives and contributions from various literary and historical aspects. Besides, this issue also features research articles on humanities, science, commerce, music and more. We hope to receive encouragement and support from the entire teaching camaraderie and seek your best wishes in the endeavour.

Dr. Subhamay Ghosh
Dr. Ratna Bandyopadhyay

সম্পাদকের দপ্তর থেকে

Covid-19 -এর থাবার নিচ থেকে অতিমারী-পীড়িত, ত্রস্ত পৃথিবী আলোকিত জীবনস্পন্দে ফিরতে শুরু করেছে আবার। তবু, এই 'নিউ নর্ম্যাল' অভিহিত জীবনধারাকে 'স্বাভাবিক' ভাবা যাচ্ছেনা কিছুতেই। কোভিড-পূর্ববর্তী আর কোভিড-পরবর্তী - সময়ের নিরিখে এ-দুয়ের বিভাজনরেখা তীব্র হয়ে জ্বলছে ভুক্তভোগীর চেতনায়। রাষ্ট্র-পরিচালনা, সামাজিক সম্পর্কের বুনিয়াদ, ব্যক্তিক-জীবন – সে জীবনের গোপনীয়তা, বৈশ্বিক অর্থনীতি, শিক্ষা-ব্যবস্থা, সংস্কৃতির ভিন্ন ভিন্ন পরিসর ও পারস্পরিক আদান-প্রদান – কোনোকিছুই এর নেতিবাচক প্রভাব এড়াতে পারেনি। দুরূহতম চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছিল সম্ভবত অতিমারী-পর্বে গৃহবন্দী মানুষের মানসিক সুস্থিতির প্রশ্নটি। অন্তর্জাল-নির্ভর সামাজিক মাধ্যমের যে অতি-বাড়া- বাড়ির বিরুদ্ধে অতীতে আমরা আমাদের ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছি বারবার – এই কঠিন সময়ে নির্বাসিত মানুষকে জীবনে বেঁধে রাখার ক্ষেত্রে তাদের আশাব্যঞ্জক ভূমিকাকে কোনোভাবেই অস্বীকার করা যাবে কি? বোধহয় নয়। রুটি -রুজির অনিশ্চয়তা, মৃত্যুর আতঙ্ক আর স্বজন-পরিজন হারানোর আশঙ্কা যখন প্রতিমুহূর্তে জীবনকে ধাওয়া করে, তখন সেই শ্বাসরোধী পরিবেশে সৃষ্টিকর্মে অবিচল থাকা যে কতটা কঠিন জীবনের মাশুল গুণে আমরা তা বুঝেছি। তবু, মৃত্যুকে পেরিয়ে গিয়ে বেঁচেবর্তে থাকার এটাই ছিল বিকল্পহীন 'বিশল্যকরণী'।

তাই, নির্ধারিত সময়ের থেকে বেশ কিছুটা পিছিয়েই প্রকাশ পাচ্ছে QUEST-এর (ISSN 2319-2151) বর্তমান কলেবরটি। সময়ের সঙ্গে আপোষ করেই বিগত দুটি বর্ষের (2020-21 এবং 2021-22) দুটি ক্রমসংখ্যাকে বাঁধতে হয়েছে যুগ্মকে – এক মলাটের ভিতরে। শারীরিক এবং মানসিক যাবতীয় জড়তাকে পরাস্ত করে নিজেদের ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত যে শিক্ষাজীবীরা QUEST এর চলার পথকে সুগম করলেন সম্পাদকমণ্ডলীর তরফে তাঁদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এরই মধ্যে আমরা পেরিয়ে এসেছি বঙ্গে নবজাগরণের অন্যতম পুরোধা মনীষী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দ্বিশততম জন্মবার্ষিকী (1820-1891)। সেইসঙ্গে বহুমুখী প্রতিভার ঔজ্জ্বল্যে দীপ্ত বাংলায় 'নবজাগরণের শেষমানিক' বলে যাঁকে চিহ্নিত করতে চান অনেক আলোচকই সেই শ্রদ্ধেয় সত্যজিৎ রায়ের জন্মশতবার্ষিকীও (1921-1992)। QUEST -এর এই যুগ্ম-সংখ্যার (volume : 15 & 16) 'বিশেষ আকর্ষণ' অংশটি তাঁদের জীবনব্যাপী কর্মকাণ্ড ও অবদানকে সাহিত্য এবং ইতিহাসের নানান কৌণিকতায় পরখ করে দেখতে চেয়েছে। এছাড়াও বিজ্ঞান, বাণিজ্য, সঙ্গীতবিদ্যার মতন নানামুখী বিদ্যাশৃঙ্খলার প্রতিনিধিত্ব লক্ষ করা যাবে অন্যান্য গবেষণাধর্মী প্রবন্ধগুলির পাতায়-পাতায়। শেষ পর্যন্ত মৃত্যুভয়কে জয় করে আমরা যে আবার ধীরে ধীরে ফিরতে পারছি সৃজন-প্রয়াসে – এই ধূসর সময়ের প্রান্তরে সেটাই শ্যামল দিগন্তরেখা।

ড. শুভময় ঘোষ
ড. রত্না বন্দ্যোপাধ্যায়

QUEST
Volume 15 & 16

Contents **Page No.**

From The Editors' Desk
সম্পাদকের দপ্তর থেকে

SECTION - I
(Special Attraction)

Iswar Chandra Vidyasagar And women's Questions : A Humanist Approach
- Dr. Jayashree Sarkar 01

নারীশক্তির প্রজাপতি উড়ান ঃ মুক্তিদূত বিদ্যাসাগর
- ড. শিখা ঘোষ 08

গোয়েন্দা গল্পে ভ্রমণের স্বাদ ঃ সত্যজিতের ফেলুদা
- ড. শুভশ্রী দাস 13

'পিকুর ডায়রি' - কলম থেকে ক্যামেরায়
- প্রীতম চক্রবর্ত্তী 18

সত্যজিতের সায়েন্স ফিকশন ঃ মূল্যবোধের বিজ্ঞান
- ড. ভাস্কর খাঁড়া 24

সত্যজিতের সিনেমায় মনুষ্যেতর প্রাণী
- সঞ্জীব মান্না 29

SECTION II
(Articles in Bengali)

সংগীতবিদ্যায় গানের গুণ ও দোষ
- ড. সৈকত দাস 35

শতবর্ষী পদাতিক
- ড. বাসন্তী ভট্টাচার্য 44

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মৌরিফুল' গল্পের সুশীলা চরিত্র ঃ স্বভাব-নিহিত প্রকৃতির বিস্ময়
- ড. মমতাজ বেগম 51

SECTION III
(Articles in English)

Man in Relation to Others: 55
Human Relationship as viewed by Jean Paul Sartre
- Dr. Aditi Bhattacharya

The Current Scenario of E-Commerce 62
in India : Analytical Study
- Dr. Arup Kumar Sarkar

A Brief Review on Vitamin A 71
- Dr. Bireswar Mukherjee

Foraging Behaviour of Indian Honey Bee 74
Apis Cerana Indica (*Hymenoptera-Apidae*)
In Marigold Flowers in Howrah, India
- Supriya Mondal

Section I

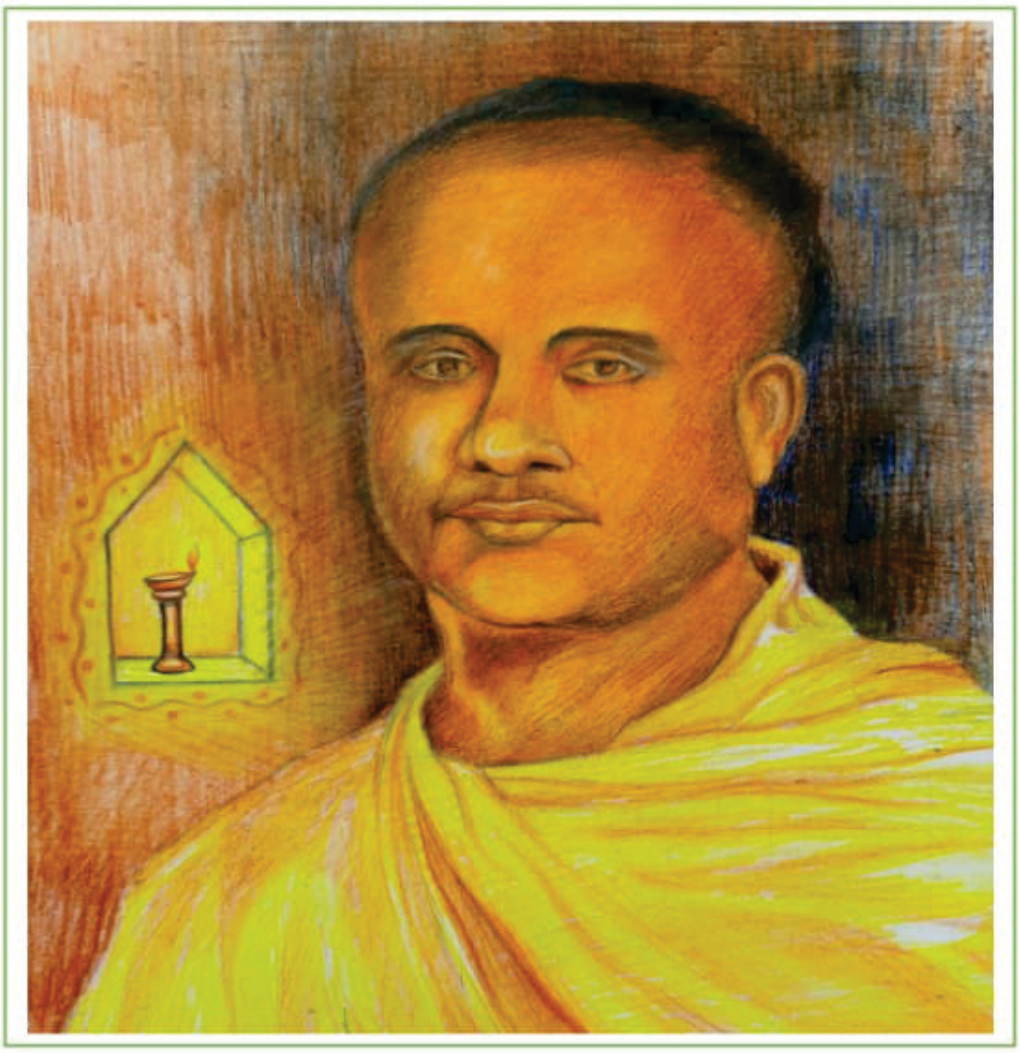

ISWAR CHANDRA VIDYASAGAR

(1820 - 1901)

বাংলায় নবজাগরণের ঊষার কিরণ

Ray of Dawn in Bengal Renaissance

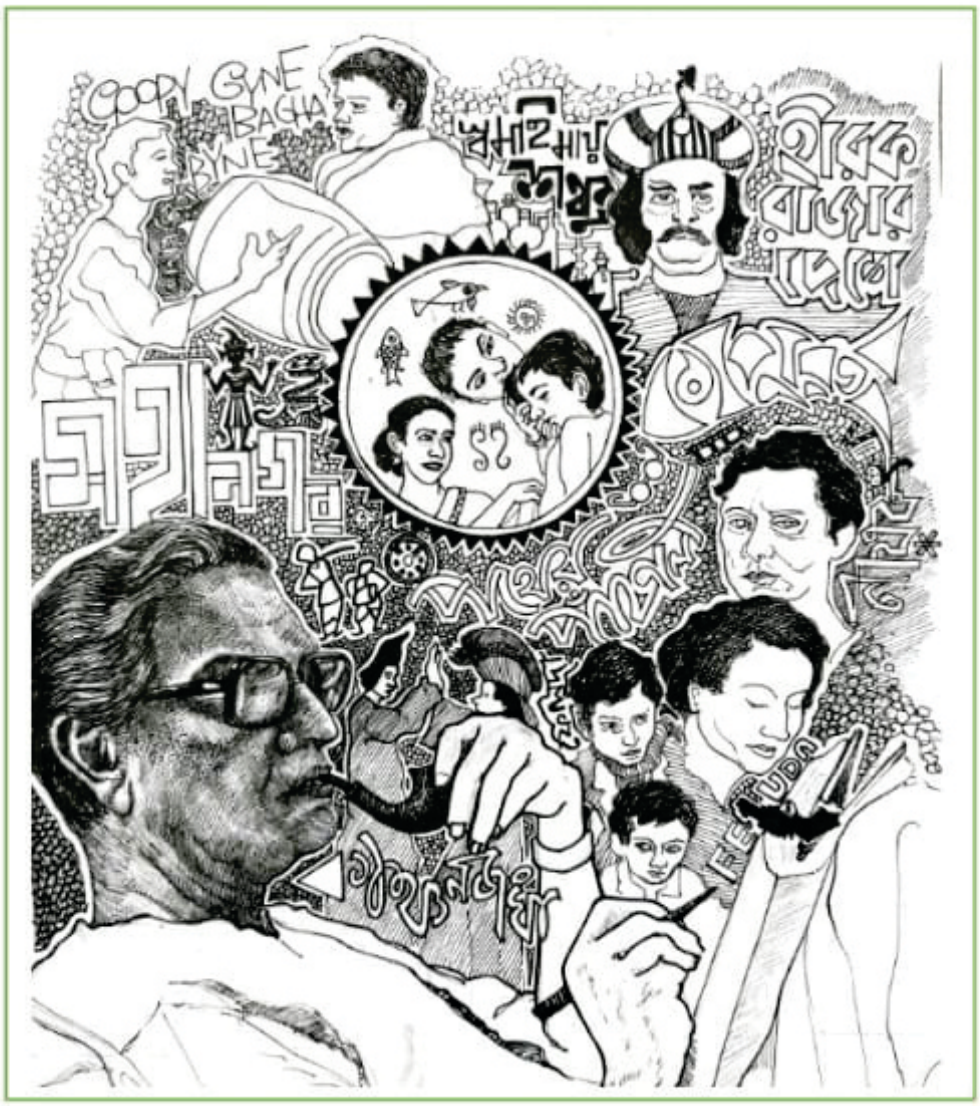

SATYAJIT RAY

(1921 - 1992)

বাংলায় নবজাগরণের শেষ 'মানিক'

Last 'Gem' of Bengal Renaissance

Ishwar Chandra Vidyasagar and Women's Question : A Humanist Approach

Dr. Jayashree Sarkar

[Abstract : *The primary thrust of this paper is to focus on Ishwar Chandra Vidyasagara, a social reformer who was on the forefront of women's cause in 19th century Bengal. This essay tries to understand his approach, essentially humane, using pragmatic ethics based on human reason along with compassion in order to bring about an end to the unending sufferings and sorrows of women due to various contemporary social practices .*

Keywords*: Garbhadhana Goshthipati Gurumashai Kulin Sati Shastra* **]**

The colonial rule with all its constraints was also the transmitter of new and regenerative ideas. That undoubtedly brought a significant change in the social and cultural outlook of the new middleclass intelligentsia. The criticisms and initiatives of the Christian missionaries who harped on the condition of women in Bengal, had a positive role in this regard. It created an enlightened public opinion , and even if it was not homogenous regarding the abolition of outdated customs such as Sati rite, child marriage, rigours of widowhood,'kulin' polygamy or undertaking initiatives for women's education, offered new dimensions of change and became the centre of fiery controversy. But the intent was in no uncertain terms- a traditional, religious and orthodox society was to be transformed. And women, it would seem, were both the focus and principal beneficiaries of these changes.

Vidyasagar (1820-1891 CE), of course, it should be admitted, was not a lone crusader in his fight for women's causes in his time as there were the members of Brahmo Samaj, Young Bengal and other erudite social refomers as well as persons belonging to landed class. Vidyasagar could not rest because the sufferings of women had profoundly affected him as a human being. He could identify the psyche of the then Hindu society that shaped the contours of women's subordination and the way that could end subordination and sufferings, using various tools such as appeal to humanity,reason and legislation. He was the Principal of Sanskrit College. He declared that he would not follow the dictates of customs. He would act according to his conscience. He was well aware that he had to take cognizance of social patterns and ideologies of the historical moment in which he lived. So any assessment of his social work has to understand the social roots of his perceptions. The noted historian AmalesTripathi has called Vidyasagar a 'traditional moderniser' as to think of him as someone who had adhered to his philosophical legacy and yet never turned his face away from the challenges of contemporary demands.

Dr. Jayashree Sarkar, Associate Professor, Dept. of History, Uluberia College, Howrah

The life of a widow was a socially endorsed misery; the treatment of widows revealed the worst of society's attitude to women. Though the Act of XVII of 1829 saved married women from a compulsive death, by 'Sati' rite, it did not grant them a fruitful entry to life. Malnourished, devoid of any guarantee of their own right, shut out from all luxury, the Hindu widows were expected to lead a rigid and austere life of celibacy. Vidyasagar assessed every social problem in the light of human values and aspirations. He knew fairly well that in Indian society, people could be convinced only if a Shastric (scriptural) sanction in favour of remarriage was found. He resorted to a laborious and critical study of the Hindu scriptures. His rational scrutiny brought to light irrefutable sanction in favour of widow remarriage in 'Parashara Samhita'. He was also aware of the fact that legal sanction, besides scriptural ones, was required for the success of a movement for the introduction of widow remarriage. With the blessings from his parents, he set to work. His first tract on widow remarriage 'Bidhaba Bibaha Prachalit Haoa Uchit Kina Etodbishoyok Prastab' came out on January 1855. Here he expressd " if widow remarriage is introduced, there will be respite from intolerable sufferings of widowhood, sins committed due to adultery and foeticide could be avoided and the families could be saved from scandals". In the same year, on October, he published his second tract, "Bidhaba Bibaha Prachalit Haoa Uchit Kina Etodbishoyok Prostab, Dwitiya Pustak". These two books were widely read and sold.On 4th October, 1855, Vidyasagar sent a petition, bearing 986 signatures, to the government for legislation on widow remarriage. Sir J.P. Grant, a Member of the Governor General-in-Council, presented the bill on widow remarriage on 17th November, 1855. On 9th January, 1856,again the bill was presented in the Council. Eminent persons such as Devendra Nath Tagore, Justice Dwarkanath Mitra, Akshay Kumar Dutta, Dakshinaranjan Mukhopadhyay, Rajnarayan Basu and others were the signatories in favour of the bill on widow remarriage. Besides, many petitions in favour of widow marriage were sent from Bengal and outside too. But there was tremendous opposition in Bengal itself where a mass petition from Raja Radhakanta Deb of Shovabazar, 'goshthipoti' of Hindu orthodox community, bearing signatures of 33,000 persons, was submitted 17th March, 1856, strongly urging the government not to interfere with the Hindu social customs.On 5th July 1856, Raja Radhakanta Deb again sent a petition to the government bearing 617 signatures. It was a triumph for Vidyasagar and other reformers when on 26th July 1856, widow marriage act was passed by Governor Lord Dalhousie as "Act XV of 1856 ,being an Act to remove all legal obstacles to the Marriage of Hindu Widows". The first widow marriage in Bengal was solemnized, on lines with Hindu rites,on 7th December 1856 between Shrish Chandra Vidyaratna, a teacher of Sanskrit College and a ten year old widow, Kalimati Debi. Huge number of people,even some pundits of orthodox section, attended this ceremony. On the very next day, Madhusudan Ghosh married a widow named Thakomoni. Between 1856 and 1867, Vidyasagar arranged sixty widow remarriage for which he incurred an expenditure of rupees 82,000. On 11th August, 1870, he gave his son Narayan Chandra's marriage to a fourteen year old widow, Bhabasundari Debi.

But he was deceived by many. In the name of marriage, some committed polygamy or left their wives after taking away the ornaments. So later on, he arranged that the groom had to sign on a one rupee stamp paper where it was written that a monthly allowance of rupees ten was to be given to the wife for maintenance and after his death, his property was to be shared among his wife and children. He was well aware that marriage was not the panacea of widows' sufferings. On 15th June 1872, Hindu Family Annuity Fund was established with very laudable objects of providing monetary allowance after a person's death to his parents, wife or children. It was so arranged that if a person, till his death, deposit rupees two and a quarter every month, then after his death, his wife or relations would be provided with rupees five every month. Though he was not the founder, he was associated with it till 1875.

It was education which was the most important component of social change affecting a girl's life. A handful of educated families in the 1830s and 1840s took initiatives in this regard.The first significant institutional step was taken with the foundation of Bethune School (Victoria Hindu Balika Vidyalaya) on 7th May1849 by John Elliot Drinkwater Bethune who was the President of the Council of Education. Though the school started with twenty one girl students, it came down to seven students due to opposition. But a year later success came when the enrollment rose to thirty four.No fee was charged. All the expenses were borne by Bethune. From 1850, Vidyasagar was associated with this school as Honorary Secretary. To encourage this noble effort, he made arrangement that an excerpt from MahanirvanaTantra to be inscribed on either side of the carriage that used to transport the girl students to the school- “that a girl should be properly raised by imparting her education, with care”. Governor Frederick J.Halliday took initiative in early 1857 to spread female education. He used to consult Vidyasagar and sought for his advice.During this time, Vidyasagar believed earnestly that the attitude of the government was in favour of female education. As an Assistant Inspector of Schools, from 24th November 1857 till 15th May 1858, he enthusiastically set up thirty five girls' schools at Hooghly, Burdwan, Midnapore and Nadia which incurred an expense, he calculated, as of rupees 845. But very soon, the situation changed. In spite of his appeals, no government financial aid came. His true adherence to this noble cause and subsequent disillusion led him to resign from the post of Principal of Sanskrit College on 5th August 1858. To run the girls' schools, he set up a fund for women's education where he received donations from many, including landed classes and even from Cecil Beadon, the Lieutenant Governor of Bengal Presidency. Though he left government job with a high salary of rupees 500, he had no hesitation to assist the government or to give advice when asked for.Through the Director of Public Instruction, W.S.Atkinson, Mary Carpenter, an English educationist and social reformer, was introduced to Vidyasagar. To set up a Normal School for Teachers Training ,as wished by Carpenter, a Committee was formed on 1st December 1866 where Vidyasagar became a member. He even accompanied Carpenter to places for this work. His was very happy when Chandramukhi Basu, as the first Bengali woman

received her Master degree from Calcutta University in 1884. Through a letter, he blessed her and gifted her a set of William Shakespeare's work.

The obvious corollary that followed was Vidyasagar's vehement opposition to the custom of child marriage.As early as 1850, his essay 'Balyabibaher Dosh' (Evils of Child Marriage) was published in 'SarvashubhakariPatrika' No.1 August 1850. There he wrote about the harmful results of child marriage. A girl bride was deprived of proper education; early marriage often leading to premature motherhood, death during childbirth and infant mortality. Thus he based his argument on consideration of health and education of future mothers. Another baneful consequence of child marriage was that the children, who were considered the future of a nation, born from early marriage, were often found to be physically weak and mentally immature.With these, he emphasized the danger of early widowhood and above all, the need for a mature mind and body to fulfill the conditions of true marital love. Senseless customs and outmoded Shashtras were together held responsible for the evils of child marriage.

The ritual of 'Garbhadhana' leading often to premature cohabitation , followed by early motherhood, female and infant mortality became the subject of great concern in the social ferment of the late 19th century. At the insistence of Vidyasagar, the Age of Consent Act of 1860 was passed which established ten as the age of consent for a girl. There was no opposition as it did not affect the performance of 'Garbhadhana' ceremony. In 1884, Parsi reformer Behramji M. Malabari's Note on Infant Marriage was circulated among the government officials and the members of the Indian intelligentsia and England for raising the age of consent from ten to twelve in Section 375 of the Indian Penal Code. Katherine Mayo's Mother India brought out hospital reports of early deaths during childbirth, premature child birth, infant mortality. The situation became worse with the death of Phulmoni, a child bride who had just crossed ten years, while consummating her marriage. As she was over ten years, it was believed that she had given consent and no stern legal action could be taken. The Government was also thinking of raising the age of consent. In January 1891, Sir Andrew Scoble, the Hon'ble Law Member, introduced a bill to raise the age of consent from ten to twelve years for both married and unmarried girls. It meant that there was a possibility that for the brides attaining puberty during the crucial period between ten and twelve years, the ritual 'Garbhadhana', considered to be mandatory in Hindu religion, could not be performed. The Brahmo leaders, scores of progressive men and women were in favour of the bill. But many educated persons were against the bill, citing various reasons of their own. The bill polarized the society. The opposition was fierce and levelled against the government decision. Even Vidyasagar, the archetypal liberal reformer was critical of the Age of Consent Bill and could not give unqualified support. His concern was for girls above twelve years of age. The Act would leave them unprotected through immediate consummation of marriage. His suggestion was that if the measure could be linked with the attainment of puberty, which he believed, the girls usually reached, not before the age of

thirteen, they would receive extensive legal protection. But government did not give any heed to his views. The Age of Consent Act was passed on 19th March 1891 as Act X of 1891 by the Governor General in- Council establishing twelve as the age of consent for both married and unmarried girls.

Vidyasagar exposed the evils of the obnoxious practice of kulin polygamy and the extent to which it crippled the society. The kulins enjoyed highest status among Brahmins. They were permitted to take indefinite number of wives with whom thay were not under any obligation to live, perform marital duties or to maintain them. The kulin grooms usually visited their in-laws' house when in financial need. Many kulin girls had to resort to unfair means by taking up prostitution to maintain themselves or gratify their mortal desires when denied maintenance in their paternal places. Often the only recourse to families of kulin girls was to adopt wrongful ways, at any cost, to give semblance of legitimacy to the unborn child. To save the honour of the family, many kulin brides committed suicide if the situation became different. With the death of a kulin groom, a large number of women became widows and to sustain themselves, took up unfair means of living. Those who could endure hardships in their parental homes, led a miserable life devoid of basic amenities, for they were looked upon as burdens of the family. In search of an effective means of livelihood, marriage became a sort of profession among the kulins. Before Vidyasagar took up this issue, a number of petitions were sent to the government, since 1855, to abolish this practice. Opposition was also there who held that as this practice was limited to only a small section of the society, no legal interference was needed. The practice would gradually whither away with time and spread of education. On 27th December 1855, Vidyasagar sent an appeal to the government to abolish polygamy. His narrated his personal experience regarding his teacher 'Gurumoshai', in his native place, a kulin Brahmin who used to earn his living by visiting his different in-laws' house. The execrable consequence was that wife and daughter were denied of maintenance and had to take recourse to prostitution to earn their living. On 1st February 1866, Vidyasagar sent a second petition to the government. He received support of many eminent persons such as Maharaja Mahatab Chand of Burdwan, Raja Joykrishna Mukhopadhyay, Raja Satish Chandra Ray, Digambar Mitra, Ramanath Thakur, Satyasharan Ghosh. He himself was also one of the signatories of other petitions too. He published his tract on kulin polygamy on 10th August 1871 – 'Bahubibaha Rohit Haoa Uchit Ki Na Etodbishoyok Bichar'. Here he vividly described the miseries and sufferings as well as treatment meted out to the kulin brides. He appealed to human conscience for non - adherence of this practice and to come forward for its outright abolition. He prepared a list of kulin Brahmins of Hooghly who resorted to polygamy. Kulin Brahmins numbering 197 of 86 villages married 1288 girls. A kulin Brahmin named Ishwar Chandra Mukhopadhyay, aged fifty five years, residing at Kalaskati village in Barisal district married 107 times. He published his second tract on kulin polygamy 'Bahubibaha Rohit Haoa Uchit Ki Na Etodbishoyok Bichar, Dwitiya Prastab'

on 1st April 1873. This book received stern criticism from Bankim Chandra Chattopadhyay in his journal 'Bangadarshan', Ashar 1280 BE.

Vidyasagar was a humanist and a social reformer. He was distressed and saddened by the miseries and sufferings of women due to prevalent social customs in the 19th century social milieu. He did not conform to the prevailing social practices that brought endless sufferings to women. His work on social reform, besides support, entailed apathy, affront and deception.But his inner virtues and morality prevented him from making any compromise with or accept what he understood cruel and barbaric. He upheld, what he believed earnestly.

References :

1. Adhikari, Santosh Kumar, Viyasagar and the New National Consciousness, Calcutta 1990
2. Altekar, A.S., The Position of Women in Hindu Civilization, Delhi 1962
3. Bandopadhyay, Chandicharan,Vidyasagar, Allahabad 1909
4. Bandyopadhyay, Sekhar, From Plassey To Partition And After, New Delhi 2015
5. Borthwick, Meredith,The Changing Role of Women in Bengal:1849-1905, New Jersey 1984
6. Bose, Sib Chandra, The Progressive History of the Hindu Family Annuity Fund from its Formation in 1872 upto 31st March 1928, Calcutta 1928
7. Chakraborty, Usha, Condition of Bengali Women Around the 2nd half of the 19th Century, Calcutta 1963
8. Deb, Chitra, Antahpurer Atmakatha, Calcutta 2000
9. Forbes, Geraldine, Women in Modern India, New Delhi 2000
10. Ghosh, Binoy, Vidyasagar O Bangali Samaj, Calcutta 1984
11. Guharay, Siddhartha & Chattopadhyay, Suranjan, Adhunik Bharatborsher Itihas:1707-1964, Kolkata 2021
12. Heimsath, Charles H., Indian Nationalism and Hindu Social Reform, Bombay 1964
13. Indramitra, Karunasagar Vidyasagar, Kolkata 2001
14. Kosambi, Meera, 'Girl Brides and Socio-Legal Change:Age of Consent Bill (1891) Controversy' in Economic & Political Weekly,Vol XXXVI,1991
15. Laird, Michael Andrew, Missionaries and Education in Bangal:1793-1873, Oxford 1972
16. Mehta, Rama, Socio-Legal Status of Women in India, Delhi 1987
17. Murshid, Ghulam, Reluctant Debutante:Response of Bengali Women to Modernization, Rajshahi 1849-1905
18. Nag, Kalidas (ed), Bethune School & College Centenary Volume:1849-1949, Calcutta 1949
19. Nistarini (Debi), 'Sekele Katha' in Naresh Jana et al (eds), Atmakatha, Vol II, Calcutta 1962
20. Sarkar, Biharilal, Vidyasagar, Calcutta 1895.
21. Sarkar, Tanika, Hindu Wife, Hindu Nation:Community, Religion And Cultural Nationalism, New Delhi 2001

22. Sen, Amiya P., Hindu Revivalism in Bengal 1872-1905: Some Essays in Interpretation, Delhi 1993

23. Sen, Asok, Iswar Chandra Vidyasagar and his Elusive Milestones, Calcutta 1977

24. Tripathi, Amales, Vidyasagar: The Traditional Moderniser, Calcutta 1974

নারীশক্তির প্রজাপতি উড়ান ঃ
মুক্তিদূত বিদ্যাসাগর

ড. শিখা ঘোষ

[**বিষয়-চুম্বক**: *প্রাচীন, মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগে বাঙালি নারীর অবস্থান, শিক্ষাগত পরিবর্তনের যে ধারা বিশেষত উনিশ শতকের কুসংস্কারের-অশিক্ষার অন্ধকার দূরীকরণে জ্ঞানের আলোকবর্তিকা হাতে কীভাবে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব ঘটেছে এবং তাঁর অবদান আলোচনা এই প্রবন্ধের মূল রূপরেখা।*

সূচক-শব্দ: *নারী, স্ত্রীশিক্ষা, মেয়েদের, নারীশিক্ষা, নারীপ্রগতি, বিদ্যাসাগর, মডেল স্কুল, বেথুন, বালিকা বিদ্যালয়, সমাজ সংস্কার, শিক্ষাসংস্কার*]

'মহুয়া কাব্যের 'সবলা' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিধাতার কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন -

''নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার
হে বিধাতা ?
...
শুধু শূন্যে চেয়ে রব ? কেন নিজে নাহি লব চিনে
সার্থকের পথ।
...
দুর্গমের দুর্গ হতে সাধনার ধন
কেন নাহি করি আহরণ
প্রাণ করি পণ।''[১]

পুরুষতান্ত্রিক বাঙালি সমাজে নারীকে অনেক লড়াই করে, অনেক কষ্ট সহ্য করে তার অধিকার অর্জন করতে হয়েছে কয়েক শতাব্দী ধরে। যে লড়াই আজও প্রবহমান। তবুও প্রাচীন যুগ থেকে মধ্যযুগের সীমা অতিক্রম করে আধুনিক যুগের আঙিনায় দাঁড়িয়ে নারীর নিজেকে মেলে ধরার প্রেক্ষিত এবং আকাশটি যেমন বহুলাংশেই বিস্তৃত হয়েছে, তেমনি তার লড়াইয়ের রকমফেরটিও বদলেছে ভিন্ন ভিন্ন ধারায়।

প্রাচীন ভারতে নারীর অবস্থান সম্পর্কে বিচ্ছিন্ন কিছু তথ্য মেলে, যা থেকে তৎকালীন নারীদের একটি আপাত অসম্পূর্ণ ছবিই আমরা পাই। ঋকবৈদিক যুগে অভিজাত পুরুষরা গুরুগৃহে থেকে শিক্ষালাভের সুযোগ পেলেও নারীরা সরাসরি শিক্ষার সুযোগ সেভাবে পায়নি। যদিও হিন্দুধর্ম ও শাস্ত্রে স্ত্রীশিক্ষাকে সমর্থন জানানো হয়েছে। যে কারণে আমরা জানি যে ঋকবৈদিক

Dr. Sikha Ghosh, SACT-I, Dept of Bengali, Uluberia College, Howrah

যুগে অপালা, ঘোষা, মৈত্রেয়ী, রুক্মিণী, লীলাবতী-র মতো কিছু বিশিষ্ট গুণবতী নারীর নাম আমরা পাই যারা কেবল বিদ্যাচর্চা নয়, অশ্বচালনা পর্যন্ত করতে পারতেন। এমনকি প্রাচীন ভারতে একসময় মেয়েরা নিজেদের জীবনসঙ্গী নির্বাচনের সুযোগ পেত। এ সম্পর্কে সুকুমারী ভট্টাচার্য তাঁর 'প্রাচীন ভারতে নারী' প্রবন্ধে লিখেছেন -

> ''ঋগ্বেদের একটি শ্লোকার্ধে পড়ি ঃ স্বয়ং সা মিত্রং বনুতে জনে চিৎ - অর্থাৎ 'নারী জনসমাজে নিজের বন্ধু বেছে নিত। এ বন্ধু সারাজীবনের সঙ্গী হলে স্বামীই হয়। মানে স্বামীকে পছন্দ করে বিয়ে করার স্বাধীনতা নারীর ছিল।''[২]
>
> প্রাচীন ভারতে মাতৃপ্রাধান্য তাই অনেকাংশেই বজায় ছিল। তবে এই স্বাধীনতার চিত্র বেশিদিন স্থায়ী ছিল না। কারণ ঋগ্বেদেরই আর একটি সূক্তে মেলে - 'ভুক্ত্বোচ্ছিষ্টং বধ্বৈ দদ্যাৎ' অর্থাৎ পুরুষ খেয়ে এঁটোটা স্ত্রীকে দেবে। এর থেকে বোঝা যায় সুপ্রাচীন যুগে নারীর কিছুটা স্বাধীনতা থাকলেও অচিরেই নারী পুরুষের অনুগামিনী আজ্ঞাবহ দাসীতে পরিণত হয়।

মধ্যযুগের বাংলাদেশের কয়েকজন নারী সংস্কৃতচর্চায় সুনাম অর্জন করেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ষোড়শ শতকের ফরিদপুরের কোটালি পাড়ার প্রিয়ম্বদা দেবী। তিনি ছিলেন সুপণ্ডিত শিবরাম সার্বভৌমের কন্যা। প্রিয়ম্বদা তাঁর বাবার কাছে কাব্য, অলংকার, ন্যায়শাস্ত্র ইত্যাদির পাঠ নেন। তাঁর পিতা প্রিয়ম্বদার পাত্র অন্বেষণে বহু স্থানে ঘোরেন। শেষে কাশীতে রঘুনাথ মিশ্র নামে কনৌজ বিদ্যার্থী ব্রাহ্মণ প্রিয়ম্বদার রূপে-গুণে মুগ্ধ হয়ে তাঁর পাণি প্রার্থনা করেন। শেষে বিবাহ হয়। প্রিয়ম্বদা অনেক দুরূহ সংস্কৃত গ্রন্থের টীকা লেখেন। তাঁর রচিত 'মদালসা উপাখ্যান', 'শ্যামরহস্য' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি বিশেষ বিখ্যাত হয়েছিল। সতেরো শতকের এক বিখ্যাত বাঙালি ব্রাহ্মণ কন্যা বৈজয়ন্তীর নাম পাওয়া যায়, যিনি সংস্কৃত কবিতা লিখতেন। আঠারো শতকের সূচনা পর্বেও সংস্কৃত শাস্ত্রজ্ঞ কবি আনন্দময়ীর কথা জানা যায়। এ প্রসঙ্গে অপু দাস, 'বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ ঃ নারীবাদী পাঠ', গ্রন্থে বলেছেন -

> ''আনন্দময়ীর পরিবারে সংস্কৃত শাস্ত্রচর্চার চল ছিল, বাংলা কাব্য লেখারও ঐতিহ্য ছিল। আনন্দময়ীর গান আর তাঁর পিসতুতো বোন গঙ্গামণির রচিত বিয়ের মঙ্গলগান অনেকদিন পর্যন্ত বিক্রমপুরের মেয়েদের মুখে মুখে প্রচারিত হয়েছিল।''[৩]

এছাড়াও মধ্যযুগের বাঙালি সমাজে জাহ্নবা দেবী, সীতাদেবী, মৈত্রেয়ীর মতো বিদুষীর সন্ধানও আমরা পাই। তবে মধ্যযুগের শেষ দিক থেকে এবং ঊনিশ শতকের সূচনালগ্নে মেয়েরা ক্রমাগত অন্তঃপুরে বন্দী হয়ে পড়ে এবং বাঙালিসমাজে মেয়েদের লেখাপড়া শেখাটা প্রায় অপ্রচলিত হয়ে ওঠে। যদিও অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ এবং উনিশ শতকের সূচনায় বেশ কিছু বিদ্যাচর্চায় পারদর্শী ব্যতিক্রমী নারীর দৃষ্টান্ত মেলে। এ প্রসঙ্গে 'উনিশ শতকে স্ত্রীশিক্ষা' গ্রন্থে গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার রচিত 'স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক (১৮২২) বইটির বক্তব্য প্রসঙ্গে বলা হয়েছে -

> ''অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ও উনিশ শতকের সূচনায় আনন্দময়ী দেবী, গঙ্গামণি দেবী, হটি বিদ্যালঙ্কার, শ্যামমোহিনী দেবী, দ্রবময়ী দেবীর বিদ্যার খ্যাতি ছিল বহু বিস্তৃত। এইকালে অনেক জমিদার আর অভিজাত পরিবারের মেয়ে লেখাপড়া শিখতেন।এই ধরণের ব্যতিক্রমী কিছু দৃষ্টান্তের কথা বাদ দিলে, উনিশ শতকের গোড়ার দিকে বাঙালি সমাজে মেয়েদের লেখাপড়া শেখাটা একরকম অপ্রচলিত হয়ে ওঠে।''[৪]

উনিশ শতকে মেয়েদের এই লেখাপড়া শেখাটা অপ্রচলিত হয়ে ওঠার পিছনে মূলত যে কারণগুলি ছিল তা হল - বাল্যবিবাহ এবং পুরুষ শাসিত সমাজের পুরুষ প্রাধান্য। এই পুরুষ প্রাধান্য বজায় রাখার জন্য মেয়েদের নানা ভাবে ভয় দেখানো হতো। এ প্রসঙ্গে পূর্বোক্ত গ্রন্থেই বলা হয়েছে -

> ''... তাই নারীকে সবরকম অধিকার থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত রাখার জন্য স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে সমাজে নানা রকম অলীক ও অবাস্তব ধারণা গড়ে তোলা হলো। লেখাপড়া শিখলে মেয়ে বিধবা অথবা অসতী হবে - এই বিশ্বাস উনিশ শতকে সূচনা কালে ছিল অতি প্রবল। শুধু সূচনা কালে কেন, শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধেও চক্ষু কর্ণ দুটি ডানায় ঢাকা পণ্ডিতের দল বুক ফুলিয়ে এই ধরণের অপপ্রচার করতে ইতস্তত করতেন না।''[৫]

মোটামুটিভাবে এই ছিল প্রাচীন যুগ থেকে আধুনিক যুগে নারীশিক্ষার ও নারীপ্রগতির লেখচিত্র। তবে এর মধ্যেও বেশ কিছু শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ যেমন রাজা রামমোহন রায়, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রাধাকান্ত দেবের মতো মানুষ নারীশিক্ষা ও

নারীপ্রগতির পক্ষে ছিলেন। রামমোহন রায় ১৮১৯ সালে সহমরণ বিষয়ক বাদানুবাদ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বাঙালি নারীর জ্ঞানবুদ্ধির অপ্রতুলতার প্রতিবাদে বলেছিলেন -

> ''স্ত্রীলোকদিগের বুদ্ধির পরীক্ষা কোন কালে লইয়াছেন যে তাহাদিগকে অল্পবুদ্ধি কহেন? কারণ বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানশিক্ষা দিলে পরে, ব্যক্তি যদি অনুভব ও গ্রহণ করিতে না পারে, তখন তাহাকে অল্পবুদ্ধি কহা সম্ভব হইতে পারে; আপনারা বিদ্যাশিক্ষা জ্ঞানোপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায়ই দেন না, তবে তাহারা বুদ্ধিহীন, ইহা কি রূপে নিশ্চয় করেন?''[৬]

এই সময় থেকেই সমাজে একশ্রণীর মানুষ মেয়েদের শিক্ষা ও প্রগতি সম্পর্কে ভাবতে শুরু করেন। যদিও খ্রিষ্টান মিশনারীদের প্রচেষ্টাতেই প্রথম সেই শিক্ষার দ্বার উন্মোচিত হয়ে ছিল কিন্তু যে বাঙালি যুগনায়ক, শিক্ষাচিন্তক, মমতাময় হৃদয় দিয়ে বাঙালি নারীদের সংস্কারের গুটি কেটে বের করে আনার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা চালান তিনি হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

১৮২০ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ সেপ্টেম্বর, মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন বিদ্যাসাগর। পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা ভগবতী দেবী, স্ত্রী দীনময়ী দেবী এবং পুত্র নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৮২৮ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি কলকাতায় একটি পাঠশালায় ভর্তি হন এবং ১৮২৯ সালের জুন মাসে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন। অত্যন্ত মেধাবী ও প্রতিভাবান ছাত্র হিসেবে ১৮৩৯ সালের মধ্যেই তিনি 'বিদ্যাসাগর' উপাধি লাভ করেন। পরে তিনি দুই বছর ঐ কলেজে ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, বেদান্ত, ন্যায়, তর্ক, জ্যোতির্বিজ্ঞান, হিন্দু আইন এবং ইংরেজি বিষয়ে অধ্যয়ন করেন। ১৮৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে সংস্কৃত কলেজ ত্যাগ করার অল্প পরেই তিনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা ভাষার প্রধান পণ্ডিতের পদ লাভ করেন এবং পরের মাসে ওই কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। শিক্ষা সংস্কারের সাথে সাথে বাঙালি সমাজের নারীদের মুলত হিন্দু বাল্যবিধবা রমণীদের যন্ত্রণার উপশম ঘটিয়েছিলেন তিনি সমাজসংস্কারের মধ্য দিয়ে। কৌলীন্যপ্রথার কুফল স্বরূপ তৎকালীন হিন্দুসমাজে বাল্যবিধবাদের জীবন ছিল দুর্বিষহ। ১৮৫৬ সালের ১৬ই জুলাই 'বিধবা বিবাহ আইন' পাশ করেন। এই আইন প্রসঙ্গে 'বিদ্যাসাগর' গ্রন্থে অমিয় কুমার সামন্ত জানিয়েছেন -

> ''আইন পাশের আগেই 'বিধবাবিবাহ বিষয়ক প্রস্তাব' যে অভূতপূর্ব আলোড়ন তুলেছিল, ১৮৫৬ সালের ১৬ জুলাই প্রস্তাবটি আইনে পরিণত হওয়ার পরেও সেই উত্তেজনার নিবৃত্তি ঘটল না। বর্ণ হিন্দু ছাড়া মধ্য শ্রেণীর জাতগুলির মধ্যে বিধবাবিবাহ অপ্রচলিত হয়ে গিয়েছিল। জাত হিসাবে মর্যাদাবান হওয়ার লক্ষ্যে উচ্চবর্ণের মধ্যে প্রচলিত প্রথাগুলি মধ্য ও নিম্নবর্ণের জাতগুলিও গ্রহণ করেছিল। এই সমস্ত জাতের অনেকগুলির মধ্যে বিধবার, বিশেষ করে অল্পবয়সী বিধবাদের, বিবাহ প্রচলিত ছিল। কালক্রমে উচ্চবর্ণের অনুকরণ করতে গিয়ে এই বিবাহ বন্ধ হয়ে যায়। শান্তিপুরের তাঁতীরা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে শাড়ীর পাড়ে ''বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর চিরজীবিত হয়ে'' বুনে দিয়েছিলেন। ... শান্তিপুরের তাঁতীরা সম্ভবত তাঁদের জাতের পুরাতন প্রচলিত প্রথাকে শাস্ত্রসন্মত ভাবে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য ঐভাবে বিদ্যাসাগরকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।...''[৭]

একই সঙ্গে বহু বিবাহ প্রথা যাতে রদ হয় তার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন, নানা লেখালিখি, চিঠিপত্রের মধ্য দিয়ে। পরবর্তীকালে এই কুপ্রথা বিলুপ্ত হয়। সমাজ সংস্কারক বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে 'উনিশ শতকের বাংলা' গ্রন্থে বলা হয়েছে -

> ''ধর্মসংস্কার নারীপ্রগতি ও শিক্ষাবিস্তার নিয়ে রামমোহনের মতো প্রগতিবাদীরা এবং ইয়ংবেঙ্গলের মতো উগ্র প্রগতিবাদীরা সক্রিয় আন্দোলন শুরু করেছিলেন। তারপর সেই আন্দোলনের ধারাকে আরও অগ্রসর করলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দে)। সতীদাহপ্রথা রদের পর সমাজে বাল্যবিধবাদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। তাদের বহু অসহনীয় রীতিনীতির অনুশাসন মানতে হত। সংস্কৃতজ্ঞ বিদ্যাসাগর পরাশর সংহিতা থেকে উদ্ধৃতি তুলে দেখালেন যে হিন্দু শাস্ত্রে বিধবা বিবাহের অনুমোদন আছে। সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের ও সরকারকে এ বিষয়ে তিনি প্রভাবিত করলেন। অবশ্যই তিনি এই কাজে সাহায্য পেলেন প্রগতিবাদী ও উগ্রপ্রগতিবাদীদের কাছ থেকে। শেষপর্যন্ত লর্ড ডালহৌসি বিধবা বিবাহের আইন পাস করলেন (১৮৫৬ খ্রিঃ)। বিদ্যাসাগর শুধু আইন করেই থেমে থাকলেন না, নিজের পুত্রেরও বিবাহ দিলেন এক বাল্যবিধবার সঙ্গে। অনেক বিধবার চোখের জল তিনি মোছাতে সক্ষম হলেন।''[৮]

এবার আসা যাক উনিশ শতকে মেয়েদের শিক্ষাপ্রসারে বিদ্যাসাগরের ভূমিকা নিয়ে। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, খ্রিষ্টান মিশনারিদের হাত ধরেই প্রথম প্রকাশ্য বালিকা বিদ্যালয়ের সূচনা। স্কুল সোসাইটির বালকদের সঙ্গে বালিকাদেরও পরীক্ষা

দেওয়ার ব্যবস্থা করেন রাধাকান্ত দেব তার নিজের বাড়িতে। ১৮১৯ খ্রিঃ 'ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটির' হাতে বালিকা বিদ্যালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ১৮২৪ খ্রিষ্টাব্দে মিস কুকের উদ্যোগে ২৪টি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলেও সেখানে পড়ুয়ার সংখ্যা খুব বেশি ছিল না। ১৮২৬ খ্রিষ্টাব্দে 'নেটিভ সোসাইটি ফর নেটিভ ফিমেল এডুকেশন' নামে একটি সভার হাতে এই সমস্ত স্কুলগুলির দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়। এই স্কুলগুলোতে সাধারণত মুচি, বাগদি, নমঃশূদ্র, জেলেদের মেয়েরা পড়তে আসত না। ১৮৪৭ সালে মধ্যবিত্ত ঘরের ভদ্র বালিকাদের জন্য বারাসাতে প্যারীচরণ সরকার ও নবীনকৃষ্ণ মিত্র বেসরকারী উদ্যোগে প্রথম একটি স্কুল নির্মাণ করেন। ১৮৪৮ সালের এপ্রিল মাসে বড় লাটের আইন পরিষদের সদস্য হিসেবে জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন ভারতে আসেন। মেয়েদের স্কুল তৈরির জন্য সরকারি সহযোগিতার আবেদন করে সাড়া না পাওয়া সত্ত্বেও রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সহায়তায় ১৮৪৯ সালের ৭মে 'ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল' চালু করেন। সম্ভ্রান্ত ঘরের চার থেকে দশ বছর বয়সী মেয়েদের এখানে পড়ানো হতো। এই শিক্ষা ছিল অবৈতনিক এবং দূরবর্তী স্থানে যাওয়ার জন্য গাড়ির ব্যবস্থা থাকবে। এখানে মেয়েদের বাংলা শেখানো হত, বিভিন্ন সেলাইয়ের কাজ এবং অভিভাবকদের অনুমতি থাকলে অল্প স্বল্প ইংরেজি শেখানো হত। ১৮৫০ সালে কলকাতার হেদুয়ার কাছে স্কুলের নিজস্ব ভিত্তিপ্রস্তর প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময় বেথুন বিদ্যাসাগরকে অবৈতনিক সম্পাদক রূপে এই স্কুলের দায়িত্ব নিতে বলেন। ডিসেম্বর মাসে এই অনুরোধ রেখে বিদ্যাসাগর দায়িত্ব নেন। তবে বিদ্যাসাগর এই স্কুলের পাঠ্যক্রম এর বিশেষ কোনো উন্নতি বা পরিবর্তন যেমন ঘটাননি, তেমনি এই স্কুলে নিম্নবর্ণের নারীদের পড়াশোনার কোনো অধিকার ছিল না। ১৮৫৪ সালে হ্যালিড সাহেব বাংলার ছোটলাট হলে তাঁর উদ্যোগে দক্ষিণবঙ্গের সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক হন বিদ্যাসাগর। আর মাতৃভাষা শিক্ষার প্রসারকল্পে গ্রামে গ্রামে মডেল স্কুল স্থাপনে উদ্যগী হয়েছিলেন। তবে এই প্রচেষ্টা পরিকল্পনার অভাবে খুব একটা সার্থক হয়নি। তখন বিদ্যাসাগর নিজ উদ্যোগেই বাংলার গ্রামে গ্রামে অনেকগুলি মডেল স্কুল নির্মাণ করেন এবং তার খরচও তিনি নিজেই ব্যয় করতেন। এপ্রসঙ্গে 'বিদ্যাসাগর ঃ নির্মাণ-বিনির্মাণ পুনর্নির্মাণের আখ্যান' গ্রন্থে বলা হয়েছে -

''... এই ঘটনায় বিদ্যাসাগর মনে করেন, তিনি নিজে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করলে সেগুলিও সরকারি অনুদান পাবে। কেবল এই ধারণার বশবর্তী হয়ে এবং কোনও সরকারী অনুমতির তোয়াক্কা না করে, 'বিশেষ' পরিদর্শক হিসেবে ১৮৫৭-র নভেম্বর থেকে ১৮৫৮র মে অর্থাৎ মাত্র ৭ মাসের মধ্যে, তিনি হুগলির বিভিন্ন গ্রামে ২০টি, বর্ধমানে ১১টি, মেদিনীপুরে ৩টি ও নদীয়ায় একটি মিলিয়ে মোট ৩৫ টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয়গুলির জন্য মাসে খরচ হত৮৪৫ টাকা, ছাত্রী সংখ্যা ছিল প্রায় ১৩০০।...''[৯]

আমরা বুঝতে পারছি মেয়েদের শিক্ষার প্রসারে বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টার কোনো খামতি ছিল না। শুধু বিদ্যালয় স্থাপন করাই নয়, একই সঙ্গে শিশুপাঠ্য উপযোগী বই রচনা ও অনুবাদকর্মও তিনি শুরু করে দেন। এ প্রসঙ্গে 'উনিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি' গ্রন্থে জানা যায় - ''অল্প বয়সের শিক্ষার্থীদের জন্য যে সব বই তিনি লিখেছিলেন, তাতে আদৌ ঈশ্বরের প্রসঙ্গ ছিল না। 'বর্ণপরিচয়', 'কথামালা', 'নীতিবোধ', 'অখ্যানমঞ্জরী' প্রভৃতি বইতে মানসিক বিকাশের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। বিদ্যাসাগর সভ্যতা থেকে আসা নীতিবোধকে শাস্ত্রের বা ধর্মীয় অনুশাসনের উপরে স্থান দিয়েছিলেন। পড়াশোনায় মনোনিবেশ, সত্যভাষণ, পিতামাতার সেবা, অসৎসঙ্গ বর্জন, দুর্বলের উপর অত্যাচার না করা, স্বার্থপরতা পরিহার, বিনয়, আত্মনির্ভরতা, যর্থাথবাদিতা, নির্ভীকতা, কুসংস্কার বিশ্বাস না করা, এসবই নৈতিক মুল্যবোধের উপরে বিদ্যাসাগর জোর দিয়েছেন। ... 'চরিতমালা' ও 'জীবনচরিত্র'-এ তাঁদের কথাই আছে, যাঁদের মধ্যে অনেকেই দুঃসহ দারিদ্র সত্ত্বেও বুদ্ধি, পরিশ্রম ও সততার জোরে অক্ষয় কীর্তি অর্জন করেন।... মালা জপ করার সংস্কৃতিতে বিদ্যাসাগরের আস্থা ছিল বলে মনে হয় না।''[১০]

যদিও বিদ্যাসাগরের ভাবনার মধ্যে কিছু সংকীর্ণতা ছিল, যেমন তিনি হিন্দু সম্ভ্রান্ত বা ভদ্র ঘরের মেয়েদের শিক্ষা বা দুর্দশামোচনে উৎসাহী হলেও তথাকথিত নিম্নবর্ণের হিন্দু কিংবা মুসলমান রমণীদের নিয়ে বিশেষ কোনো কথাই বলেননি। তাঁর রচিত 'বর্ণপরিচয়' -এ গোপাল, রাখালদের কথা থাকলেও কোনো মুসলমান বালকের কথা হলা হয়নি। বিশেষভাবে বলা হয় নি তেমন কোনো বালিকাদের কথাও। কিংবা শুধু পড়াশোনা করা বালকই সুবোধ বালক, খেলা করলেই সে ভালো নয় এমন ভাবনা আধুনিক শিক্ষা- চিন্তার পরিপন্থী। তথাপি উনিশ শতকের কুসংস্কারে আবিল সমাজ ব্যবস্থায় দাঁড়িয়ে তিনি নিজের সমগ্র জীবনের কর্ম ও আদর্শ দিয়ে যে প্রচেষ্টা করেছিলেন তা চিরস্মরণীয়। এ প্রসঙ্গে অমিয় কুমার সামন্ত রচিত 'বিদ্যাসাগর' গ্রন্থের বক্তব্যের সঙ্গে সহমত পোষণ করতেই হয় -

'সতীপ্রথা, অবাঞ্ছিত কন্যাসন্তান হত্যা, পরিবারে কন্যাসন্তানের অবহেলা, বিধবার অশেষ শারীরিক যন্ত্রণা ও অকাল মৃত্যু ইত্যাদির ফলে বহুদিন ধরে ভারতীয় সমাজে নারীদের দৈহিক অস্তিত্বই ছিল সঙ্কটাপন্ন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে নারীকে

এইরূপ ধর্মীয় ও সামাজিক প্রথা থেকে রক্ষা করে দৈহিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে রাষ্ট্র ও সমাজ সংস্কারকরা তৎপর হয়েছিলেন। পরবর্তী পর্যায়ে নারীশিক্ষার প্রচলনের ফলে নারী সামাজিক মর্যাদায় কিছুটা প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিল। এই বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। ... বিদ্যাসাগর এই ব্যবস্থাকে শুধু সমর্থনই করেননি, নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টাকে তিনি অভিনন্দিত করেছিলেন। পুরুষের সঙ্গে সমানাধিকারের প্রশ্ন তখনও অনালোচিত। কিন্তু সেই সময়েই সম্পত্তিতে নারীর অধিকার এবং নারীর তথাকথিত সতীত্বকে সম্পত্তির উত্তরাধিকারের নিয়ামকরূপে স্বীকার না করে নারীর অধিকার ও মর্যাদাবোধে একটি অন্যমাত্রা যোগ করেছিলেন। ..."[১১]

বিংশ শতাব্দীতে যে নারী সমাজের বুকে এগিয়ে এসে পুরুষের সঙ্গে তার সমানাধিকারের দাবিতে সোচ্চার হয়েছে, এই সমাজের অর্ধেক আকাশে তাকে উনিশ শতকীয় কুসংস্কারের গুটি কেটে প্রজাপতি উড়ানের ডানা মেলতে শিখিয়েছিলেন যে মহামানব তিনি বিদ্যাসাগর – একথা অনস্বীকার্য। আজ একবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে তাঁকে নিয়ে কিছু কথা বলতে যে সমর্থ হলাম সেজন্য একজন নারী হিসেবে বিদ্যাসাগরকে শতকোটি প্রণতি জানাই।

সূত্র-সংকেত ঃ

১. *রবীন্দ্র রচনাবলী, ১০ম খণ্ড, কামিনী প্রকাশন, চতুর্থ সং, মে, ২০২১, পৃ ১৫৭*

২. *পুলক চন্দ, 'নারীবিশ্ব', গাঙচিল, প্রথম প্রকাশ, ২০০৮, পৃ - ১৭*

৩. *অপু দাস, 'বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ, ঃ নারীবাদী পাঠ', বাণীশিল্প, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৬, পৃ - ৫৪*

৪. *স্বপন বসু, 'উনিশ শতকে স্ত্রীশিক্ষা', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, প্রথম প্রকাশ, ৮ শ্রাবণ ১৪১২, পৃ - ৯ (ভূমিকা অংশ)*

৫. *তদেব, পৃ - ১০ (ভূমিকা অংশ)*

৬. *রমাকান্ত চক্রবর্তী, 'তিন সংস্কারক (রামমোহন-বিদ্যাসাগর-বিবেকানন্দ)', সম্পা, স্বপন বসু ও ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী, 'উনিশ শতকের বাঙালিজীবন ও সংস্কৃতি', পুস্তক বিপনি, দ্বিতীয় সং, ২৯ মে, ২০১৫, পৃ - ২০০।*

৭. *অমিয় কুমার সামন্ত, 'বিদ্যাসাগর', প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ, মে, ২০০৪, পৃ - ৬৫*

৮. *জয়শী মুখোপাধ্যায়, 'উনিশ শতকে বাংলায় সমাজসংস্কার', সম্পা : অলোক রায় ও গৌতম নিয়োগী, 'উনিশ শতকের বাংলা', পারুল প্রকাশনী, তৃতীয় পুনর্মুদ্রণ, ২০২১, পৃ - ৮৩*

৯. *দেবোত্তম চক্রবর্তী, 'বিদ্যাসাগর নির্মাণ-বিনির্মাণের আখ্যান, কলাবতী মুদ্রা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী ২০২১, পৃ - ১৪৭, ১৪৮*

১০. *তথ্যসূত্র ৬ষ তদেব, পৃ - ১৭১*

১১. *তথ্যসূত্র ৭, তদেব, পৃ - ৮২*

গোয়েন্দা গল্পে ভ্রমণের স্বাদ ঃ সত্যজিতের ফেলুদা

ড. শুভশ্রী দাস

[**বিষয়-চুম্বক ঃ** *সত্যজিৎ রায় বাঙালির মন-মানসে এক চিরস্থায়ী নাম। তাঁর লেখা গোয়েন্দা কাহিনি, কল্পবিজ্ঞান কাহিনি কিশোর পাঠ্য হলেও তার আভ্যন্তরীণ তথ্যাদিতে কোনো ঘাটতি নেই। বাঙালি চিরকাল ভ্রমণ পিপাসু। সামান্য সুযোগ পেলেই বাঙালির ছাতা, পুঁটলি তৈরি থাকে বেরিয়ে পড়ার জন্য। এহেন জাতিকে সত্যজিৎ শুধু গোয়েন্দা দিয়ে তুষ্ট করেননি। প্রতিটি গল্পের অগ্র-পশ্চাতে আছে একেকটি বিশেষ ভূখণ্ডের দর্শনযোগ্য স্থানের অনুপুঙ্খ বর্ণনা। এই বর্ণনার বাস্তবতা এতটাই যে বাঙালি রহস্যের পাশাপাশি সেই ভ্রমণের আনন্দেও উপভোগ করতে পারে। পাহাড়, জঙ্গল, সুমদ্র, মরুভূমি, তীর্থক্ষেত্র এমনকি বিদেশ সবই ফেলুদার রহস্যকাহিনীর সঙ্গে নিখুঁত তালমিল বজায় রেখে চলে। সেই স্থানের সংস্কৃতি, জীবনচর্যা, আচার ব্যবহার সামগ্রিক ভাবে ধরা পড়েছে ফেলুদার রহস্য কাহিনির পটভূমি রূপে।*

সূচক-শব্দ ঃ *সত্যজিৎ রায়, বাঙালি গোয়েন্দা, ভ্রমণকাহিনি, মানসভ্রমণ, স্থানমাহাত্ম্য*]

বাঙালির আবেগ যে কয়েকটি নামে উদ্বেল হয়ে ওঠে, সত্যজিৎ রায় তাঁদের মধ্যে একটি অন্যতম। তাঁর রহস্য-রোমাঞ্চ, সাবলীল ও যথাযথ বাচনভঙ্গী, স্বাদু গদ্যের মোড়কে ইতিহাস ও ভূগোল এবং কল্পবিজ্ঞানের গভীর সংযোগ সূত্র রেখে যাওয়া - এই সবই তাঁর জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ। কিশোর সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান বাঙালি ভোলেনি, ভুলবেনা। তবে, শুধু রহস্য বা কল্পবিজ্ঞান নয়, নব্বইয়ের দশকে যাদের শৈশব-কৈশোর কেটেছে, তাঁদের মনে দেশভ্রমণ সম্পর্কে কৌতূহল জাগিয়ে তুলেছিলেন সত্যজিৎ রায়।

ভারতীয় উপমহাদেশের নানা প্রাচীন শহর তাঁর রহস্যমোড়া কাহিনীর পটভূমি তৈরি করেছে। সত্যজিৎ তাঁর রহস্য-নায়ককে শহরের অলিগলিতে রহস্যের সমাধান করতে পাঠান এবং তার মাধ্যমে পাঠকও শহরটিতে মানসভ্রমণ করার সুযোগ পায়। বাঙালির ভ্রমণ পিপাসা ও রহস্যলিপ্সা দুইয়েরই বাসনা পূরণ হয় ফেলুদার উপন্যাসগুলির মাধ্যমে। যে পর্যবেক্ষকের দৃষ্টি দিয়ে সত্যজিৎ অন্যতম চলচ্চিত্র পরিচালক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন সেই দৃষ্টি নিয়ে তিনি একেকটি শহরকে তার নিজস্ব বর্ণ, গন্ধ, বৈশিষ্ট্য সহ পাঠকের সামনে উপস্থাপন করেছেন। উপন্যাস পড়ার সময় পাঠক সেই শহরকে অনুভব করতে পারে, পেতে পারে তার নিজস্ব স্বাদ। 'শতরঞ্জ কি খিলাড়ি' ছবির শুটিং থেকে ফেরার সময় অভিনেতা আমজাদ খান বলেছিলেন, ''মানিকদার মধ্যে একটি বিরাট শিশু লুকিয়ে আছে, যে পৃথিবীর সব কিছু জানতে চায়, মানিকদার চোখ দুটো হল সেই বিস্ময়াবিষ্ট বালকের চোখ।''[১]

এই চোখ দুটিই তাঁকে অচেনা দেশের সৌন্দর্য অনুভব করতে শেখায়। কলকাতা থেকে শুরু হয়ে রহস্যক্রমে তথ্যের সূত্র ধরে পৌঁছে যায় কখনো বেনারস, জয়পুর, পুরী, গ্যাংটক, দার্জিলিং, সিমলা বা নেপাল। এছাড়াও বাংলার ছোট পল্লী, মফঃস্বলও বাদ পড়েনি সত্যজিতের কলমে। বোসপুকুর, গোসাঁইপুর, ঘুরঘুটিয়ার মত নাম উঠে এসেছে গল্পের মাধ্যমে। অরুণ বাগচীকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সত্যজিৎ বলেছিলেন, ''রাজস্থানই বলুন, সিকিমই বলুন কিংবা বেনারসই বসুন - জায়গাগুলো মোটামুটি আমার দেখা। এবং আমি মুগ্ধ হয়েছি বল্যেই আমার নিজের ফিলিং এর কিছুটা পাঠকের মধ্যে সঞ্চারিত করতে চেয়েছি।''[২]

Dr. Subhasree Das, Dept. of Bengali, Kabi Sukanta Mahavidyalaya, Hoogly

লেখকের মুগ্ধতা পাঠক প্রতি মুহূর্তে অনুভব করতে পারেন রহস্যের আনাচে কানাচে। লেখকের জীবনের অভিজ্ঞতা ও অনুভব কতটা জড়িয়ে থাকে তাঁর গল্পে, তা প্রতি ছত্রে পর্যবেক্ষণ করা যায়। কখনও জটায়ু বা কখনও তোপসের মাধ্যমে সত্যজিতের দৃষ্টির সহায়তার পাঠক তাঁদের সঙ্গেই যেন বেরিয়ে পড়তে পারে রহস্য উন্মোচনে। 'বোম্বাইয়ের বোম্বেটে'র চতুর্থ পরিচ্ছদের শুরুতেই তোপসের ন্যরেশন — ''পায়ে হেঁটে ঘুরে না দেখলে নতুন শহর দেখা হয় না এটা আমরা তিনজনেই বিশ্বাস করেছি।'[৩]

প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই কখনো উত্তর ভারত, কখনো দক্ষিণ, কখনো বা পূর্ব ভারতের উপকূল ফেলুদার গল্পের পটভূমি রচনা করেছে। লেখক সত্যজিতের যে পর্যবেক্ষক দৃষ্টির সম্মুখে দাঁড়িয়ে পাঠক আস্বাদ করতে পারেন ভারতবর্ষের প্রাচীন শহরগুলির ঐতিহ্য, ভূপ্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্রময়তা, তারই আরেক প্রতিফলন পরিচালক সত্যজিতের অসামান্য ফ্রেমগুলি। উপন্যাস পাঠের সময় মনে যে ছবি ফুটে ওঠে তার নিখুঁত রূপকার সত্যজিৎ। বলা ভালো, যে তাঁর কলমের আঁচড়ে পাঠকের মনে নতুন শহরের যে চিত্র আঁকা হয়ে যায়, তা সারাজীবন থাকে অমলিন। সত্যজিৎ নিজে একজন অত্যন্ত ভ্রমণপিপাসু মানুষ এবং তাঁর গল্পের বুননে তাঁরই চোখ দিয়ে দেশভ্রমণের আনন্দ অনুভব করা সম্ভব হয়। সেই সময়ের বাঙালির ভ্রমণ শুরু হত হোল্ড অল, স্যুটকেস, ফ্লাস্ক, টর্চ সহ এবং ট্রেনের ঝাঁকানি ছিল নিত্যসঙ্গী। ট্রেনের কামরাও ফেলুদার গল্পে বিশেষ স্থান পায়। মনে পড়ে 'সোনার কেল্লা'র সেই যুগান্তকারী ট্রেন যাত্রা যখন লালমোহন বাবুর সঙ্গে প্রথম দেখা হয় ফেলুদা ও তোপসের। কিংবা, ডঃ হাজরাকে দেখে সহসা ভয়ে দুর্ঘটনা ঘটিয়ে ফেলে মন্দার বোস সেই ট্রেনের কামরাতেই। 'জয় বাবা ফেলুনাথ' এর কাশীর বর্ণনা কাহিনীর রহস্যের চেয়ে কিছু কম রোমাঞ্চকর নয়। ঈশ্বরচেতনার প্রতিও নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টি সত্যজিতের তথা ফেলুদার। কাশী বিশ্বনাথের ঘাট হোক বা শঙ্করাচার্যের মন্দির কিংবা, পশুপতিনাথের মন্দির - সবকিছুই ভ্রমণার্থীর দৃষ্টিতে পাঠক দেখতে পান।

পাহাড় ও ফেলুদা

বাঙালির ভ্রমণের প্রথম পদক্ষেপ পাহাড়। মধ্যবিত্ত বাঙালির প্রিয়তম তিনটি গন্তব্য দীপুদা—অর্থাৎ—দীঘা— পুরী-দার্জিলিং। পাহাড়ের আকর্ষণ বাঙালির মনে চিরকালীন। পাহাড় সংক্রান্ত একাধিক গল্পে ফেলুদার সঙ্গে ও তোপসের বর্ণনায় পাঠক কলকাতায় বসেই মানসভ্রমণে বরফের পাহাড়, ডাল লেক বা তিব্বতি নাচগান আস্বাদ করতে পেরেছে।

'হত্যাপুরী' উপন্যাসের শুরুতেই নেপালের বর্ণনা পড়তে পড়তে পাঠক যেন ফেলুদার সঙ্গেই বেরিয়ে পড়ে — ''উত্তরে কুয়াশার আবছা পাহাড়ের পিছনে তিনটে বরফে ঢাকা পাহাড়ের মধ্যে যেটার চূড়ো মাছের লেজের মত দু'ভাগ হয়ে গেছে, যেটার নাম মাচ্ছাপুছরে, সেটার ডগা এখন গোলাপী''।[৪] কাশ্মীর চিরকালই দার্জিলিং বা সিকিমের চেয়ে বাঙালির কাছে দুর্গম। তবু সেই কাশ্মীরকেই তাঁর বর্ণ গন্ধ সহ উপস্থাপন করলেন সত্যজিৎ। অনেক ক্ষেত্রে সেই স্থানের আধ্যাত্মিক বা ঐতিহাসিক মাহাত্ম্যও বর্ণনা করেছেন সত্যজিৎ - 'ভূস্বর্গ ভয়ঙ্কর' উপন্যাসে শ্রীনগরের শঙ্করাচার্যের মন্দিরের যে বর্ণনা পাই, তাতে মানসভ্রমণ ও ভক্তিভাব দুই জাগরূক হয়—''মাথায় রয়েছে শঙ্করাচার্যের মন্দির। সম্রাট অশোকের ছেলে জালুকের তৈরী। তা ছাড়া লেকের পুব দিকে মোগল বাগান রয়েছে - নিশাদবাগ, শালিমার, চশমাশাহী — এগুলোও দেখা চাই। চশমাশাহীর স্প্রিংয়ের জল নাকি একেবারে অমৃত — যেমন স্বাদ, তেমনি ক্ষুধাবর্ধক।''[৫]

কাশ্মীরের ডাল লেক তার শান্ত কাচের মত জলের জন্য ভালো লেগেছে তপেশ ওরফে সত্যজিতের। প্রায় আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষের ভ্রমণের উপযোগী শহরগুলি ফেলুদার গল্পে পরিচয় রেখে গেছে। কাশ্মীরের উপত্যকায় সাহেবদের আনাগোনা, অসামান্য ভূপ্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য - সবই গল্পের চরিত্রের সঙ্গে মিলে গেছে সময়ে সময়ে। 'গ্যাংটকে গণ্ডগোল'— এর পটভূমিতে তিব্বত ও তিব্বতীয় বৌদ্ধ ধর্ম তথা মানুষের জীবনাচরণ নিয়ে বহু পর্যবেক্ষণ করেছেন সত্যজিৎ। তোপসে বলছে, ''সিকিমে তিব্বতের অনেক কিছুই এসে জমা হয়েছে.... তিব্বতের গান, তিব্বতের খাবার, তিব্বতের পোশাক, তিব্বতের মুখোশ পরা নাচ''।[৬]

সিকিমের পটভূমিতে এই মিশ্র সংস্কৃতির আলাপ পাঠকের জ্ঞানের পরিধি বাড়ায়। নেপাল বা সিকিমের মেয়েদের পোশাক, অলংকার বিষয়েও চর্চা রয়েছে তাঁর পর্যবেক্ষণে। ভারতীয় সংস্কৃতির একাধিক সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্য ধরা পড়েছে ফেলুদার উপলব্ধির হাত ধরে। বাঙালির ভ্রমণ ইচ্ছা ও ভ্রমণের নানা অসুবিধা-সুবিধারও অনুষঙ্গ পাই ফেলুদার উপন্যাসে। নতুন করে

চেনায় অচেনাকে। রঙ্গীত নদী, তিস্তা নদী, ধ্বসে ক্ষতিগ্রস্ত পাহাড়ের বর্ণনা পাঠকের সামনে খুলে দেয় নতুন এক জানালা। পাহাড়ের নৈঃশব্দ, একাকিত্ব, গাম্ভীর্য ফেলুদার মাধ্যমে যতটা দেখা যায়, তার প্রকাশ আর সুচারু রূপ ফুটে উঠেছে 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'র মত সত্যজিতের চলচ্চিত্রে। পাহাড়ের পটভূমিতে চরিত্রদের মানসিক জটিলতা ও আবেগ অনুভূতির গ্রন্থন এত প্রাসঙ্গিক ভাবে খুব কম সাহিত্যিকের কলমেই দেখা যয়। পাহাড়ের চাল চলন, পাহাড়ি মানুষের সম্পর্কে জানা – এই সবই ফেলুদার কাছেই বোধহয় হাতেখড়ি হল বাঙালি পাঠকের।

বোম্বাই নগরী

'বোম্বাইয়ের বোম্বেটে'র অনেকটা অংশ জুড়ে রয়েছে বোম্বাই শহরের সৌন্দর্যের বর্ণনা এবং একেকটি বিশেষ প্রেক্ষিতে এত স্পষ্ট পথনির্দেশ যা ছবির মত শহরটিকে পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করে। প্রতিবার পড়ার সময় মনে অপূর্ব একটি ছবি ফুটে ওঠে — ''রাস্তাটা বাঁদিক দিয়ে সোজা পুবে চলে গিয়ে গোল হয়ে ঘুরে শেষ হয়েছে সেই একেবারে দক্ষিণে, যেখানের আকাশছোঁয়া বাড়িগুলো ঝাপসা হয়ে আছে বিকেলের পড়ন্ত রোদে। ওই ধনুকের মতো রাস্তাটা নাকি ম্যারিন ড্রাইভ।।''[৭]

পুরাতত্ত্ববিদ স্বামীর সঙ্গে বহু দেশ– বিদেশ ভ্রমণ করার জন্য বিখ্যাত সাহিত্যিক আগাথা ক্রিষ্টি তাঁর কাহিনীগুলির পটভূমিতে বহু দেশ–বিদেশের অনুষঙ্গ উঠে এসেছে। 'মার্ডার ইন মেসোপটেমিয়া', ডথ অন দা নাইল', 'অ্যাপয়েন্ট অ্যাট সামারা' ইত্যাদি নামের প্রভাব ফেলুদার রহস্য কাহিনীর নামগুলিতে যেন লক্ষ্য করা যায়। ২৭ থেকে ৩১ বছরে ফেলুদার বয়স থেমে আছে। চিরযুবক এই মানুষটির মধ্যে কলকাতা বা অন্যান্য শহরের প্রতি রয়েছে সমান অনুসন্ধিৎসা, যা প্রকৃতি ও জনজীবনের প্রতি সমান আগ্রহী। 'কৈলাসে কেলেঙ্কারি' উপন্যাসে মুম্বাইয়ের খুলদাবাদের প্রসঙ্গ এসেছে— হোটেল থেকে বেরিয়ে এসে দেখি বাইরে ফুটফুটে জ্যোৎস্না। দূরে দক্ষিণ দিকে নিচু পাহাড় দেখা যাচ্ছে, ওরই গায়ে বোধহয় বৌদ্ধ গুহাগুলো।''[৮]

পড়ার সময় অনেক ক্ষেত্রেই মনে হয় স্বশরীরে উপস্থিত না থাকতে পারলেও নতুন শহরটি যেন কতদিনের চেনা অলিগলি দিয়ে মনকে স্পর্শ করে গেল।

উত্তর ভারত তথা লক্ষ্ণৌ

'বাদশাহী আংটি'র লক্ষ্ণৌ শহর যেন তার সমস্ত ঐতিহ্য, স্থাপত্যশৈলী ও ইতিহাস নিয়ে উপস্থিত হয়েছে ফেলুদার গল্পে। লক্ষ্ণৌ এর বিখ্যাত ভুলভুলাইয়ার বর্ণনা — ''একটা গলির সঙ্গে আরেকটা গলির কোনও তফাত নেই দুদিকে দেওয়াল, মাথর ওপরে নিচু ছাত, আর দেওয়ালের ঠিক মাঝখানটায় একটা করে খুপরি।''[৯] মুসলিম স্থাপত্যের খিলান, গম্বুজ, অলিন্দ, ঝরোখা সহ এই প্রাচীন মিশ্র সংস্কৃতির শহরগুলো দৃশ্যে, ঘ্রাণে পাঠকের সকল ইন্দ্রিয়কে সজাগ করে তোলে। কাবাবের গন্ধ, লক্ষ্ণৌ শহরের বিখ্যাত সব খাবারের আয়োজন, জীবনচর্যার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়। হরিদ্বারের গঙ্গাতীরের একটি চিত্র সত্যজিৎ এঁকেছিলেন 'বাদশাহী আংটি' তে, তা কিশোরবেলায় পড়ার পর যতবার হরিদ্বার ভ্রমণ করেছি ততবার স্মৃতিতে ফিরে এসেছে — ''জলের মধ্যে যেন একটা মেলা বসেছে। ঘাটের উপরেই একটা মন্দির, তাঁর থেকে আরতির ঘন্টার আওয়াজ আসছে।''[১০] লছমন ঝুলার সেই অ্যাডভেঞ্চার, মহাদেবের আশীর্বাদ ধন্য হরিদ্বারের স্থাপত্য, আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য এই গল্পগুলির অন্যতম আকর্ষণ হয়ে রয়েছে। 'শকুন্তলার কণ্ঠাহার' এর পটভূমিতেও লক্ষ্ণৌ শহরের দৃশ্য প্রসঙ্গত এসেছে। তপেশের বর্ণনায়, ''আমরা পাশাপাশি একটা ডাবল আর একটা সিঙ্গল রুমে আছি। দু'ঘরের জানলা দিয়েই গুমতী নদী দেখা যায়। নদীর ওপারে পশ্চিমে যখন সূর্য অস্ত যায়, সে দৃশ্য দেখবার মতো।''[১১] এই দৃশ্য স্বচক্ষে না দেখলে এমন করে বর্ণনা করা অসম্ভব। ভারতীয় ঐতিহ্য, সংস্কৃতির প্রতি রায় পরিবারের যে গভীর অনুরাগ, তারই উত্তরাধিকার সত্যজিতের মনন ও রুচিতে স্পষ্ট। ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী রাজ্যগুলিতে তাই বারবার ছুটে গেছে ফেলুদা।

কাশী ও রাজস্থান

'জয়বাবা ফেলুনাথ' সত্যজিতের একটি মাইলস্টোন। উত্তর ভারতের এই শহর বাঙালিদেরও প্রাণের শহর। কাশীর বিখ্যাত গলি, দশাশ্বমেধ ঘাট, পুণ্যতোয়া গঙ্গা, ষাঁড় এবং অন্য রাজ্যে বাঙালির দুর্গাপুজো বহুবর্ণ একখণ্ড নকশি কাঁথার মত গল্পের সবটুকু জড়িয়ে রাখে।

গল্পের শুরু থেকে কাশী মন্দির, পাণ্ডা, ক্যালকাটা লজ ও মাছের উৎকৃষ্টতা পাঠককে লুব্ধ করে। কাশীর বনেদি বাঙালি পরিবার, তাঁদের ঐতিহ্য, জটিলতা ও ইতিহাস সবকিছু নিয়েই উপস্থাপিত হয়েছে পাঠকের সামনে। পরে চলচ্চিত্রায়নের সময়েও কাশীর এই অনন্যতা প্রকাশিত হয়েছে প্রতিটি সূক্ষ্মতার সঙ্গে, যার জন্য দর্শকের প্রভূত প্রশংসা লাভ করেছিল এই চলচ্চিত্রটি। 'সোনার কেল্লা' উপন্যাসের পটভূমি ও কাহিনী ফেলুদার অন্যান্য গল্পের মতই ওতপ্রোত ভাবে যুক্ত। জয়সলমীর কেল্লার হলদে বেলে পাথরের ওপর সূর্যের আলোর ছটা দেখে সত্যজিৎ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তাঁকে 'সোনার কেল্লা' করে গড়ে নিতে। জয়সলমীর দুর্গের অলিগলি, মন্দির, চৌমাথা, ময়ুর, ভগ্নাবশেষ ফুটিয়ে তোলে রাজস্থানের ঐতিহ্যময় সৌন্দর্য। এই উপন্যাসের কাহিনী অনুযায়ী জয়পুর, জয়সলমীর এর পাশাপাশি রামদেওড়ার মত ছোট স্টেশনের উল্লেখ রেখেছেন মানিক। গাড়ি খারাপ হওয়া এবং উটের পিঠে উঠে মরুভূমির মধ্যে দিয়ে ছুটে যাওয়ার দৃশ্য অবিস্মরণীয়। উটের বর্ণনায় লিখেছেন– ''গরু ছাগলের মত উট চড়ে বেড়াচ্ছে যেখানে তার কোনওটার রং দুধ দেওয়া চায়ের মতো, আর কোনওটা আবার ব্ল্যাক কফির কাছাকাছি।''[১২] রাজস্থানের পটভূমিতে এই গল্পের বিস্তার সাধারণ মানুষের কাছে রাজস্থানের ভিন্নতর চিত্র গড়ে তুলেছিল। বাঙালির ভ্রমণের তালিকায় পাকাপাকি ভাবে জায়গা করে নিয়েছে রাজস্থান ও জয়সলমীরের 'সোনার কেল্লা'।

বাংলার গ্রাম

শুধুই অন্য রাজ্য বা অন্য দেশ নয়, 'ঘুরঘুটিয়ার ঘটনা'য় পলাশী থেকে প্রত্যন্ত গ্রাম ঘুরঘুটিয়ায় যাওয়ার রাস্তা, পুরনো শ্যাওলাধরা বাড়ির চিত্র দক্ষ পর্যবেক্ষকের মত বর্ণনা করেছেন সত্যজিৎ - ''ধানে ভরা ক্ষেতের ওপরে গাছপালায় ঘেরা ছোট ছোট গ্রাম দেখা যাচ্ছে, আর তারই আশেপাশে জমাট বাঁধা ধোঁয়া ছড়িয়ে বিছিয়ে আছে মেঘের মতো মাটি থেকে আট-দশ হাত উপরে। চারিদিক দেখে মনে হচ্ছিল একেই বোধ হয় বলে ছবির মতো সুন্দর।''[১৩]– 'গোসাঁইপুর সরগরম'-এর গ্রাম্য পরিবেশ বর্ণনায় সত্যজিতের গভীর পর্যবেক্ষণ - পচা ডোবা, পানাপুকুর, বাদুড়ে কালীর মন্দির, সেগুনহাটির মেলা, ঝিঁঝিঁর ডাক, শেয়ালের ডাক সব অনুষঙ্গে গ্রাম্য পরিবেশের অসামান্য উপস্থাপনা। অন্ধকার বন বাদাড়, দূর থেকে ভেসে আসা ট্রানজিস্টারের শব্দ, শালুক ঢাকা পুকুর পাড়ে বসে কথা বলা সব মিলিয়ে গ্রাম জীবনের নস্টালজিয়া ঘেরা ছবি উঠে এসেছে।

বিদেশ

শুধু দেশের মধ্যে নয়, বিদেশের বর্ণনাতেও সেই সাবলীল ভঙ্গী, সেই অনুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ লন্ডন (লন্ডনে ফেলুদা) বা হংকং (টিনটোরেটোর যীশু)–এর মত শহরের বর্ণনায় অনুষঙ্গ হিসেবে থাকে সেই দেশ, জাতির ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা ও তার প্রকাশ। প্রাক ইন্টারনেট যুগের মানুষ সত্যজিতের প্রতিটি নতুন শহরের চাক্ষুষ জ্ঞান ও নিজস্ব ধারণা উপন্যাসের ছত্রে ছত্রে সাজানো। 'লন্ডনে ফেলুদা' গল্পে টিউব রেল, কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে, পিকোডেলি, মাদাম ত্যুসোর মোমের মূর্তির মিউজিয়াম সবই ছুঁয়ে গেছেন সত্যজিৎ– ''পিকাডিলি আন্ডারগ্রাউন্ড থেকে রওনা হয়ে সাউথ কেনসিংটনে চেঞ্জ করে গ্রিন লাইন ধরে সোজা রিচমণ্ড।''[১৪]

লন্ডনের জনসমুদ্র, ঝকঝকে দোকান, অফিস, রাস্তা সবই আপামর বাঙালিকে চাক্ষুষ করিয়েছিলেন সত্যজিৎ। তপেশের বর্ণনায় চিরনবীন যেন সেই নব্বইয়ের লন্ডন — ঝকঝকে দোকান, শোরুম, পোশাক এবং বই, কলমের দোকান, লালমোহন বাবুর তিন পাউণ্ড দিয়ে কলম কেনা। এবং আমার ব্যক্তিগত পছন্দের ২২১ বি বেকার স্ট্রিটে শার্লক হোমসের বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে ফেলুদার সংলাপ — ''গুরু, তুমি ছিলে বলেই আমরা আছি। আজ আমার লন্ডন আসা সার্থক হল।''[১৫]

ফেলুদার গল্পের পটভূমি ও ভিন্ন ভিন্ন ভ্রমণের অভিজ্ঞতায় মিলে মিশে যায় একদিকে তার প্রখর বিচরবুদ্ধি ও একদিকে নিসর্গ সৌন্দর্য উপভোগের আকাঙ্ক্ষা। সূর্যাস্তের মোহময় বর্ণচ্ছটার মধ্যে ফেলুদার বুদ্ধির দীপ্তি যেন প্রতিফলিত হয়। তিনটি মুখ্য চরিত্রের মধ্যেই সত্যজিতের ব্যক্তিত্ব ভাগ করে দিয়েছেন তিনি। ফেলুদার মার্জিত, পরিশীলিত অথচ দৃঢ় ব্যক্তিত্ব, লালমোহনবাবুর সরলতা, তপেশের তারুণ্য, অনুসন্ধিৎসা সবই আসলে সত্যজিতেরই একেকটি চারিত্রিক গুণ। গোয়েন্দা সাহিত্যের মোড়কে ভ্রমণ সাহিত্যের মিশ্রণ একাধারে সত্যজিতের প্রখর দৃষ্টি ও রোম্যান্টিক চেতনার যৌথ সান্নিধ্য।

পাহাড়ের সৌন্দর্য, লাল টালির বাড়ি, সূর্যের রক্তাভ রশ্মি ও প্রথম কাঞ্চনজঙ্ঘার দর্শন – ফেলুদার গল্পের সহজ সাবলীল ভাষার মোড়কে ভ্রমণের অতুলনীয় স্বাদ বাঙালি পাঠককের মনোযোগ আরও কয়েকশ' বছর ধরে রাখার জন্য যথেষ্ট। জনপ্রিয় বই সম্পর্কে সত্যজিৎ লিখেছেন — ''ইংরেজিতে বইয়ের বাজারে আজকাল একটা বিশেষণ চালু হয়েছে, আনপুটডাউনেবল। যে বই একবার পড়ব বলে পিক আপ করলে আর পুট ডাউন করবার যো নেই।''[১৬]

ফেলুদার কাহিনী গোয়েন্দা বা ভ্রমণ সাহিত্য যে প্রকরণেই গণ্য হোক না কেন, আসলেই 'আনপুটডাউনেবল'।

সূত্র-সংকেতঃ

১. *শঙ্করলাল ভট্টাচার্য/'দেশ'/এবিপি প্রাইভেট লিমিটেড/কলকাতা-৭০০০০১/মার্চ ২৮, ১৯৯২/পৃষ্ঠা ৫৪।*

২. *শ্যামলকান্তি দাস (সম্পা)/'লেখক সত্যজিৎ রায়' শিবরানী প্রকাশনী/কলকাতা ৮৬/পৃষ্ঠা ১০৩।*

৩. *সত্যজিৎ রায়/'বোম্বাইয়র বোম্বেটে'/আরো সত্যজিৎ/আনন্দ পাবলিশার্স/ফেব্রুয়ারি ২০০২/কলকাতা/পৃষ্ঠা ৪৬৫।*

৪. *সত্যজিৎ রায়/'হত্যাপুরী'/ফেলুদা সমগ্র (২য় খণ্ড)/আনন্দ পাবলিশার্স/কলকাতা/২০০৫/পৃষ্ঠা ১।*

৫. *সত্যজিৎ রায়/'ভূস্বর্গ ভয়ঙ্কর'/ফেলুদা সমগ্র (২য় খণ্ড)/আনন্দ পাবলিশার্স/কলকাতা/২০০৫/পৃষ্ঠা ৩৯৩।*

৬. *সত্যজিৎ রায়/'গ্যাংটকে গন্ডগোল'/ফেলুদা সমগ্র (১ম খণ্ড)/আনন্দ পাবলিশার্স/কলকাতা/২০০৫/পৃষ্ঠা ১২১।*

৭. *সত্যজিৎ রায়/'বোম্বাইয়ের বোম্বেটে'/আরো সত্যজিৎ/আনন্দ পাবলিশার্স/ফেব্রুয়ারি ২০০২/ কলকাতা/পৃষ্ঠা ৪৬৫।*

৮. *সত্যজিৎ রায়/'কৈলাসে কেলেঙ্কারি'/ফেলুদা সমগ্র (১ম খণ্ড)/আনন্দ পাবলিশার্স/২০০৫/ পৃষ্ঠা ৩৩৭।*

৯. *সত্যজিৎ রায়/'বাদশাহী আংটি'/ফেলুদা সমগ্র (১ম খণ্ড)/কলকাতা/২০০৫/পৃষ্ঠা ৩১।*

১০. *সত্যজিৎ রায়/'বাদশাহী আংটি'/ফেলুদা সমগ্র (১ম খণ্ড)/আনন্দ পাবলিশার্স/কলকাতা/২০০৫/পৃষ্ঠা ৬৮।*

১১. *সত্যজিৎ রায় 'শকুন্তলার কণ্ঠাহার'/আরো সত্যজিৎ/আনন্দ পাবলিশার্স/ফেব্রুয়ারি ২০০২/কলকাতা/পৃষ্ঠা ৫১৪।*

১২. *সত্যজিৎ রায়/'সোনার কেল্লা'/ফেলুদা সমগ্র (১ম খণ্ড)/আনন্দ পাবলিশার্স/কলকাতা/২০০৫/পৃষ্ঠা ২২০।*

১৩. *সত্যজিৎ রায়/'ঘুরঘুটিয়ার ঘটনা'/ফেলুদা একাদশ/আনন্দ পাবলিশার্স/কলকাতা/ডিসেম্বর ২০০১/পৃষ্ঠা ৫৩।*

১৪. *সত্যজিৎ রায়/'লন্ডনে ফেলুদা'/ফেলুদা একাদশ/আনন্দ পাবলিশার্স/কলকাতা/ডিসেম্বর ২০০১/পৃষ্ঠা ৩২৫।*

১৫. *সত্যজিৎ রায়/'লন্ডনে ফেলুদা'/ফেলুদা একাদশ/আনন্দ পাবলিশার্স/কলকাতা/ডিসেম্বর ২০০১/পৃষ্ঠা ৩৩৩।*

১৬. *সত্যজিৎ রায়/'গোলকধাম রহস্য/ফেলুদা সমগ্র (২য় খণ্ড)/আনন্দ পাবলিশার্স/কলকাতা/২০০৫/পৃষ্ঠা ৫২।*

‘পিকুর ডায়রি’ -
কলম থেকে ক্যামেরায়

প্রীতম চক্রবর্ত্তী

[**বিষয়-চুম্বক** ঃ *সত্যজিৎ রায় চিত্র -পরিচালক হিসেবে যতখানি সমাদৃত সাহিত্যিক হিসেবে ততখানি নন, কিন্তু বাংলার বরেণ্যে সাহিত্যিকদের রচনা ছাড়াও নিজের বিভিন্ন কাহিনির চলচ্চিত্রায়ণ ঘটিয়েছেন; সরাসরি চিত্রনাট্য হিসেবে নিজের কাহিনিকে পর্দাতেও দেখিয়েছেন। তেমনি তাঁর একটি ছোটগল্প ‘পিকুর ডায়রি’ অবলম্বনে তৈরি করেছিলেন শর্টফিল্ম ‘পিকু’। যদিও শ্রী রায়ের বহুচর্চিত ছবিগুলির পাশে এই স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবিটি একটু অনালোচিতই। অথচ পরিচালকের আঙ্গিক কৌশলের পারিপাট্য এবং সমাজচেতনা খুব স্পষ্ট ধরা পড়েছিল ‘পিকু’তে। কাহিনিকে কলম থেকে নিয়ে ক্যামেরায় পৌঁছতে গিয়ে সত্যজিৎ রায় কিছু রদবদল ঘটিয়েছিলেন ঠিকই, যার মধ্যে একজন সচেতন শিল্পীর বৈশিষ্ট্যই ফুটে উঠেছিল।*

সূচক-শব্দ ঃ *সত্যজিৎ রায়, পিকুর ডায়রি, পিকু, শৈশব, সিনেমা, নিঃসঙ্গতা*]

১৩৭৭ বঙ্গাব্দের শারদীয়া ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’য় প্রকাশ পেয়েছিল সত্যজিৎ রায়ের ‘পিকুর ডায়রি’; পিতামহ বা পিতৃদেবের উত্তরাধিকার সূত্রে সাহিত্যে প্রফেসর শঙ্কু বা ফেলুদার স্রষ্টা হিসেবেই তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভা মূল্যায়িত হয়ে থাকে। উপেন্দ্রকিশোর বা সুকুমার রায়ের বহুমুখী প্রতিভাকে তো বাঙালি ‘ব্যর্থ নমস্কারে’ই ফিরিয়ে দিয়েছেন। যদিও লীলা মজুমদার নিজেই শিশুসাহিত্যের প্রতি তাঁর পক্ষপাতের কথা বলেছেন, বাঙালি পাঠকের আগ্রহও ‘পাকদণ্ডী’, ‘আর কোনখানে’ বা ‘এই যা দেখা’র মতো আত্মস্মৃতিমূলক রচনার বাইরে বৃহত্তর লীলা-কথায় ছড়িয়ে যায়নি। সত্যজিৎ রায়ের চিত্র-পরিচালক সত্তার বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটটি বাদ দিলে তিনিও সাহিত্যক্ষেত্রে কিছুটা উপেক্ষিতই, খুব নির্দিষ্ট করে বললে তথাকথিত বাঙ্গালি ‘সিরিয়াস’ পাঠকমহলে তিনি ‘আন্ডাররেটেড’। যদিও ‘পিকুর ডায়রি’র মতো আপাত-সাধারণ একটি গল্প (পরে যা অবলম্বনে ফ্রেঞ্চ দূরদর্শনের জন্য ‘পিকু’ নামের ছবি বানানো হবে), সেখানেও পরিবার-সমাজ-রাজনীতি সম্পর্কে সূক্ষ্ম সচেতনতার পরিচয় রেখেছেন স্রষ্টা।

সত্যজিৎ রায়ের পর্যবেক্ষণ এবং ‘পারফেকশন’ তাঁর প্রতিটি সৃষ্টির পরতে পরতে মিশে আছে একথা অনস্বীকার্য, আবার একথাও স্বীকার্য ‘ক্লাস ফ্রেন্ড’ বা ‘খগম’এর মতো গল্প লিখেও তিনি বাংলা ছোটগল্পের প্রথাগত পাঠচর্চায় অনালোচিতই থেকে গেছেন। মনে রাখতে হবে ইংরেজি ছোটগল্প ‘অ্যাবস্ট্রাকশান’ লিখেই তাঁর সাহিত্যের জগতে আত্মপ্রকাশ। আলোচ্য ‘পিকুর ডায়রি’ গল্পটির আঙ্গিক ভাবনা, অন্তত সাতের দশকের সূচনায় বেশ অভিনবই। অবশ্য সত্যজিৎ রায় ছোটগল্পের কোনো আন্দোলনের শরিক নন, কিন্তু নিজের পর্যবেক্ষণ শক্তি ও সৃজন প্রতিভার সমন্বয়ে সৃষ্টি করেছেন তাঁর নিজস্ব গল্পভুবন। ‘পিকুর ডায়রি’ গল্পের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ভুল বানানের ব্যবহার; আর সেখানেই আঙ্গিকের অভিনবত্ব। আসলে কোন আদর্শ বা তত্ত্বকে মাথায় রেখে সত্যজিৎ রায় গল্পটি লেখেননি, শিশুর চোখ দিয়ে তিনি দেখিয়েছেন এই জটিল পৃথিবীকে। অবশ্যই মনে পড়বে সত্যজিতের প্রথম ছবি ‘পথের পাঁচালী’ তথা অপু-দুর্গার কথা; গ্রাম জীবন, খোলা মাঠ, কাশফুল যার পটভূমি। ‘ পিকুর ডায়রি’ তো এক খণ্ডিত নগর-যাপন। আর শিশুটি নিজের মনের কথা লিখে চলেছে নীলখাতায়। এই নীলেও হয়তো এক অসীমের সাংকেতিক ব্যঞ্জনা ছড়িয়ে রেখেছেন সত্যজিৎ রায়। মুক্তির জন্য উৎকণ্ঠাও ধরা থাকতে পারে সেই নীলে। রবীন্দ্রনাথের মৃণাল (‘স্ত্রীর পত্র’) নীল আকাশ আর নীল সাগরের সামনে দাঁড়িয়েই তো জগৎ এবং জগদীশ্বরকে উপলব্ধি করেছিল, নীল ছেঁড়া কাগজেই অনিলা (‘পয়লা নম্বর’) রেখে গিয়েছিল তাঁর ‘নিরুদ্দেশ যাত্রা’র অভিঘাত, যক্ষপুরীতে বিশু আর নন্দিনীর (‘রক্তকরবী’) মাঝেই জেগে থাকে এক টুকরো নীল আকাশ; ‘শারদোৎসবে’ ‘সাদা মেঘের ভেলা’ ভাসে ‘নীল আকাশে’; মনে পড়বে রবি ঠাকুরের ‘ডাকঘর’ নাটকের অমলকে, পাহাড়

Pritam Chakraborty, SACT-I, Dept. of Bengali, Uluberia College, Howrah

দেখে যার মনে হয়েছিল - 'পৃথিবীটা কথা কইতে পারে না, তাই অমনি করে নীল আকাশে হাত তুলে ডাকছে।' অমল অবশ্য সমাজের এমন মালিন্যের ছবি দেখেনি। রবীন্দ্রনাথের নাটকের তত্ত্ববিশ্ব একটু অন্যরকমের। গল্পকার সত্যজিৎ সচেতনভাবে পিকুর বাক্য গঠনের অসংগতি সৃষ্টি করেছেন তার লেখার খাতায়; যতি চিহ্নের ব্যবহারে রেখেছেন ভ্রান্তি যেমন -

- 'ওনুকুল এনে দিয়েছে বল্লো কুড়ি পয়সা দাম মা আগেই পয়সা দিয়েছে। আমি রোজ ডাইরি লিখবো রোজ যেদিন ইসকুল থাকে না'
- 'টেলিফোন একটু আগেই কিরিং কিরিং কিরিং হল আর আমি দৌড় এলাম আর এসে হ্যাল বল্লাম ওমা দেখি বাবা বাবা বল্লেন কে পিকু আমি বল্লাম হ্যা আমি বাবা বল্লেন মা নেই আমি বল্লাম না মা নেই বাবা বল্লেন কোথায় মা আমি বল্লাম মা হিতেশ কাকুর সংগে সিনেমা বড়দের যেটা সিনেমা সেটা দেখতে গেছে তাই মা নেই বাবা বল্লেন ও বলে কড়াক করে ফোনটা রেখে দিলেন আমি আজ পেলাম'

পিকু ও তার বাবার ফোনালাপের যে বর্ণনা ধরা পড়েছে পিকুর জবানীতে তা মনে করায় পরবর্তী প্রজন্মের অন্যতম আর এক পরিচালক ঋতুপর্ণ ঘোষের নিজের কাহিনি-আশ্রিত ছবি 'উৎসবে'র একটি দৃশ্য। শিশুশিল্পী বিনীতরঞ্জন মৈত্র বুম্বার ভূমিকায় এভাবেই সংলাপ বলেছিল ঠাম্মা ভগবতী দেবী - চরিত্রাভিনেত্রী মাধবী মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে -

বুম্বা (ছুটে এসে) ঃ ঠাম্মা একটা লোক এসেছে বলল আমার জেঠু হয়।

ভগবতী দেবী ঃ কে লোক?

বুম্বা ঃ আমায় বলল তুমি অসিতের ছেলে, আমি বললাম হ্যাঁ, বলল আমি তোমার এক জেঠু এসো আমরা কোলাকুলি করি। আমায় একটা চকলেট দিল।

ভগবতী দেবী (চকলেট কেড়ে নিয়ে) ঃ না অচেনা লোকের দেওয়া চকলেট খাবে না।

বুম্বা ঃ অচেনা নয়, বলছে তোমার ঠাকুমা আছে আমি বললাম না ঠাকুমা নয় 'ঠাম্মা'। বলল হ্যাঁ, আছে? আমি বললাম হ্যাঁ উপরে। তখন এই কার্ডটা দিল বলল এটা দিয়ে এসো আমি নিচে ওয়েট করছি। এই কার্ডটা দিল।[১]

বুম্বার বলার ভঙ্গি পিকুর মতো হলেও তাঁর বাক্যগঠনে অসঙ্গতি নেই। 'উৎসব' সিনেমার শুরু থেকে 'জয় বাবা ফেলুনাথ', 'দেবী' কিংবা 'পোষ্টমাস্টারে'র প্রসঙ্গ এনে পরিচালক ঋতুপর্ণ অনন্য ভঙ্গিতে 'ট্রিবিউট' জানিয়েছেন সত্যজিৎ রায়কে। তবে সত্যজিৎ রায় আলোচ্য গল্পে পিকুর যে বানান ভুল ও বাক্য গঠনের অসঙ্গতি দেখিয়েছেন তার কারণ কি শুধুই চরিত্রটির বয়স? ছেলেটির ডায়রি লেখার বয়স হয়নি এমনটাই বোঝাতে চেয়েছেন গল্পকার? মনে রাখতে হবে পিকু যে পরিবারে বড় হচ্ছে, সেটি সমাজের উচ্চকোটির অন্তর্ভুক্ত, ছেলে ঘুমিয়ে পড়েছে ধরে নিয়ে গভীর রাতে মা-বাবা ঝগড়া করে ইংরেজিতে। তার মানে এই নয় ছেলের মাতৃভাষার দিকে তাঁরা নজর দেবেন না। আসলে ছেলেটির প্রধান সঙ্গী নিঃসঙ্গতা, 'করোনারি থমবোসি' আক্রান্ত বৃদ্ধ দাদু ছাড়া তার আর সাথী নেই। এমনও হতে পারে, লেখার বয়স হবার আগেই একাকীত্ব তার হাতে কাগজ-কলম তুলে নিতে বাধ্য করেছে।

একটা সঙ্গী থাকা খুব স্বাভাবিক ছিল - সেটি বয়সে বারো বছরের বড় দাদা। পিকু স্কুলে, দাদা কলেজে। দাদার সূত্রে এই গল্পে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটটিকে যুক্ত করে নিয়েছেন সত্যজিৎ রায়। সত্তরের উত্তাল রাজনীতি থেকে নিজেকে দূরে রাখতে পারেননি পিকুর দাদা। বাবা তাই বড় ছেলে প্রসঙ্গে বলেন 'হোললেস'; পিতা পুত্রের সম্মুখ-সংঘাত চিৎকার চেঁচামেচিতে পৌঁছায়। বহুদিন সে বাড়িতে ফেরেনা, পিকুর ভাবনায় - 'কোথায় গেছে ভগবান জানে কি বোধয় ভগবানো জানে না'। হয়ত বহু তরুণ তাজা প্রাণের সঙ্গে সেও 'সত্তরের বলি'। গল্পের প্রথম দিকে যতি চিহ্ন ব্যতিরেখে পিকু বাবা-মায়ের যে সংলাপ তুলে ধরেছে সেখানেও গোলাগুলি-বোমার প্রসঙ্গ আছে - আজকার প্রায়ই দুমদুম শব্দ হয় জানলা দিয়ে'। সেই দুমদুম শব্দের সঙ্গে পিকুর দাদার যোগ আছে এমনটা অনুমান করে নেওয়া যায়। পিকুর জবানীতে - 'দাদা কাল ছাদে টিপ দারুন টিপ ট্যাংকের উপর দইএর একটা ভাড় ছোট খুব সবচে ছোটটা ভাড় রাখলো আর অনেক দূর থেকে টিপ করে দমকরে আর ভাড়টা টুকরো টুকরো কয়েকটা আবার টুকরো রাস্তায় গিয়ে পড়ল যদি কারো মাথায় টাথায় লাগে তাহলেই হয়েছে আমি বল্লাম।

'পিকু' ছবিটি দেখার আগে 'পিকুর ডায়রি' পড়লে সেটিকে নিতান্ত পরকীয়া প্রেমের গল্প বলা একেবারেই যায় না, বরং একটি বালকের নিঃসঙ্গতার গল্প বলাই শ্রেয়। এর কারণ ছেলেটির পারিবারিক প্রতিবেশ। পিকুর মায়ের সঙ্গে হিতেশের

বিবাহ বহির্ভূত প্রেম প্রভাবিত করেছে পিকুকে। মায়ের সঙ্গ বঞ্চিত বলে বিনিময়ে নিত্যনতুন উপহার পায় মায়ের প্রেমিকের কাছ থেকে। বাবার সঙ্গে ছেলের সম্পর্কের নৈকট্যও সেভাবে চোখে পড়ে না। আবার বাবার অনুপস্থিতিতে 'হিতেশকাকু' এলে ছেলের উপস্থিতি মায়ের মনে জাগায় বিরক্তি; যে কারণে মায়ের হাতে থাপ্পড়ও খেতে হয় পিকুকে। গল্পের শেষদিকে 'পিকু' ছবিটি দেখার আগে 'পিকুর ডায়রি' পড়লে সেটিকে নিতান্ত পরকীয়া প্রেমের গল্প বলা একেবারেই যায় না, বরং একটি বালকের নিঃসঙ্গতার গল্প বলাই শ্রেয়। এর কারণ ছেলেটির পারিবারিক প্রতিবেশ। পিকুর মায়ের সঙ্গে হিতেশের বিবাহ বহির্ভূত প্রেম প্রভাবিত করেছে পিকুকে। মায়ের সঙ্গ বঞ্চিত বলে বিনিময়ে নিত্যনতুন উপহার পায় মায়ের প্রেমিকের কাছ থেকে। বাবার সঙ্গে ছেলের সম্পর্কের নৈকট্যও সেভাবে চোখে পড়ে না। আবার বাবার অনুপস্থিতিতে 'হিতেশকাকু' এলে ছেলের উপস্থিতি মায়ের মনে জাগায় বিরক্তি; যে কারণে মায়ের হাতে থাপ্পড়ও খেতে হয় পিকুকে। গল্পের শেষদিকে অবশ্য মায়ের বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার প্রসঙ্গ আছে। আর মা বাড়ি নেই বলেই পিকুও 'ময়লা' পা সোফায় তোলারপ দুঃসাহস দেখায়। গল্পের সমাপ্তি অবশ্য নীল খাতায় শেষ পাতায় পৌঁছে - 'পাতা শেষ খাতা শেষ বাস শেষ'।

এই গল্প নিয়েই ফ্লেঞ্চ টিভি চ্যানেলের জন্য সত্যজিৎ রায় নির্মাণ করলেন নাতিদীর্ঘ ছবি 'পিকু'- ১৯৮০। বিজয়া রায়ের আত্মকথায় -'মানিক ফ্রেঞ্চ টিভির জন্য একটা ছবি করবার অফার পেয়েছেন। ৩০ মিনিটের ছবি - নিজের গল্পই বেছে নিলেন ঃ 'পিকুর ডায়রি'। শুধু 'পিকু' নামটা থাকবে। এই ছবির ব্যাপারে প্যারিস থেকে এক ভদ্রলোক এসেছেন, অ্যাঁরি ফ্রেস। ভারি ভালো লোক, এবং মানিকের বিরাট ভক্ত। মানিকের উপর উনি সব ছেড়ে দিয়েছেন। উনি যা চান তাই করতে পারেন।'[২]

তারাশঙ্করের 'জলসাঘর', প্রভাতকুমারের 'দেবী', রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়', (চিত্ররূপ 'চারুলতা'), নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'অবতরণিকা', (চিত্ররূপ 'মহানগর'), থেকে নিজের লেখা গল্প 'অতিথি (চিত্ররূপ 'আগন্তুক') নিয়ে পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি বানিয়েছেন। আবার রবি ঠাকুরের তিনটি ছোটগল্প (' পোষ্টমাস্টার', 'মণিহারা' ও সমাপ্তি') আশ্রিত 'তিন কন্যা' বা প্রেমচন্দের 'সদ্‌গতি' নির্মাণে মিতায়তনের দিকেই ঝুঁকেছিলেন পরিচালক। তারাশঙ্করের 'কালিন্দী' বা শরদিন্দুর 'ঝিন্দের বন্দী' উপন্যাস ছাড়াও সুবোধ ঘোষের 'ফসিল' গল্পের চিত্রনাট্য তৈরি করেছিলেন তিনি। বিমল রায় ওই একই কাহিনি নিয়ে 'অঞ্জনগড়' ছবি বানাচ্ছেন শুনে সত্যজিৎ রায় নিজ উদ্যোগেই যোগাযোগ করেছিলেন। যদিও কোন ইতিবাচক সাড়া সে দিক থেকে আসেনি। যাই হোক, সাধারণভাবে একথা বলাই যায় ছোটগল্প আশ্রয়ে পূর্ণদৈর্ঘ্যের ছবি বানাতে গিয়ে শুধু সত্যজিৎ রায় নন, যে কোন পরিচালকই কাহিনির সম্ভাব্যতার জায়গাগুলিকে আশ্রয় করে কাহিনি ব্যাপ্ত করেন। যদি আমরা সত্যজিতেরই 'অতিথি' গল্প দেখি, সেখানে নিতান্ত কিশোর পাঠ্য একটি গল্প যখন সেলুলয়েডে পৌঁছল তখন সভ্য সমাজের বিশ্বাসের সংক্রান্তি আর মূল্যবোধের অবক্ষয়ের চালচিত্র প্রশ্ন তোলে পরিণত মননের কাছে। কিন্তু 'পিকুর ডায়রি' যখন পর্দায় এলো 'পিকু' হয়ে, সেখানে নামকরণের সংক্ষিপ্ততাই শুধু নয়, সম্ভাবনার বিস্তার তো দূরের কথা, গল্পের বেশ কিছু দিক বাদ দিয়েছেন পরিচালক সত্যজিৎ। এটাও মনে রাখতে আধঘন্টার টেলিছবি বানানোর নির্দেশই ছিল বিদেশী প্রযোজনা সংস্থার।

সত্যজিৎ রায়ের চিত্রনাট্য প্রসঙ্গে স্যমন্তক চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন -

'সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে কাহিনি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সাহিত্য-আশ্রিত। কয়েকটি ছবিতে অবশ্য স্বরচিত কাহিনি সরাসরি চিত্রনাট্যের আকারে লেখেন তিনি, যেমন কাঞ্চনজঙ্ঘা (১৯৬২), নায়ক (১৯৬৬), হীরক রাজার দেশে (১৯৮০) প্রভৃতি। অন্য লেখকের রচনার ক্ষেত্রে প্রাথমিক কিছু চরিত্র ও চিত্রগুণসম্পন্ন ঘটনাবলীকে নির্দিষ্টভাবে সাজিয়ে কিছু অংশ বর্জন করে নির্মাণ করতেন সত্যজিৎ রায়। পরিমার্জন এবং নির্মোহভাব হয়ে দৃশ্য/চরিত্রের সম্পাদনা, এই দুই স্বকীয় বৈশিষ্ট্যই সত্যজিৎ রায়ের চিত্রনাট্যের প্রধান সম্পদ। নির্মেদ বাহুল্যবর্জিত সংলাপ, উপযুক্ত যান্ত্রিক দক্ষতা, অভিনয় ও পরিচালকের তত্ত্বাবধানের সাহায্যে নির্দিষ্ট সময়েই কাঙ্ক্ষিত অভিঘাত সৃষ্টি করতে ভীষণ রকম সফল হত।'[৩]

আরেকটি বিষয় সম্পর্কেও সত্যজিতের ছবির একনিষ্ঠ দর্শকেরা মোটামুটি ওয়াকিবহাল -

'১৯৮৩ থেকে দীর্ঘ শারীরিক অসুস্থতা সত্যজিৎ রায়ের কর্মক্ষেত্রের এক বিরাট প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছিল। ডাক্তারি পরামর্শ অনুযায়ী তিনি শুধুমাত্র স্টুডিওর চৌহদ্দির মধ্যেই শুটিং করা ছাড়পত্র পান। ফলে, একরকম বাধ্য হয়েই চিত্রনাট্য ও সংলাপের প্রতি সত্যজিৎ রায় আরো বেশি করে নির্ভরশীল হয়ে পড়েন।'[৪]

'পিকু'র নির্মাণ অবশ্য এর আগে, আর সেখানে কাহিনি অনুযায়ী বহিঃদৃশ্যের প্রয়োজন বিশেষ ছিল না। বিজয়া রায়ের লেখা থেকে জানতে পারি -

'ছবির জন্য অনেক কিছুর খোঁজ শুরু হয়ে গেল। একটা ভালো বাড়ি - সেখানে ৭৫ ভাগ শুটিং হবে, একটা সিঁড়ি, গাড়ি বারান্দার ছাদ এবং সব থেকে বেশি দরকার একটা সুন্দর বাগান।'[৫]

অতঃপর

'আমরা ভারী সুন্দর দুটো বাড়ি পেয়েছিলাম শুটিংয়ের জন্য। একটা আমাদের ক্যামেরাম্যান সৌম্যেন্দুর ভাইয়ের কোম্পানির দেওয়া বাড়ি আলিপুরে, যেখানে পিকুর সিঁড়ি-ওঠা ও গাড়ি বারান্দার ছাদের শুটিং হয়েছিল। আর অন্যটা শান্তনু ও তাঁর স্ত্রী স্বাতী চৌধুরীর বাড়ি বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে। চমৎকার বিশাল বাড়ি। আর বাগানের জন্য শ্রীযুক্ত কেজরিওয়ালের বাড়ি তো ছিলই, ওঁর বাড়িতে আমাদের অবাধ গতি।'[৬]

এই তিনটি বাড়িকে ক্যামেরার ব্যবহারে কলকাতা শহরের এক উচ্চবিত্তের বসতবাটিতে পরিণত করতে সত্যজিৎ রায়ের মতোপরিচালকের কোন সমস্যা হয়নি, বরং এক অখণ্ড পটভূমি ছবিটিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছিল।

আয়তনে ছোট হলেও 'পিকু' ছোটদের ছবি নয়। যদিও নামকরণে ছোট ছেলেটির নামই আছে। 'পথের পাঁচালী' থেকে শুরু করে 'শাখা প্রশাখা' বা আগন্তুক' - ছোটদের ছবি না হয়েও শিশু-শিল্পীদের একটা গুরুত্ব ছিল সর্বত্রই। এ প্রসঙ্গে সৌকর্য ঘোষাল লিখেছেন-

'সত্যজিৎ হচ্ছে ছোটদের কাছে সেই ফারিস্তা যিনি বড়দের অঙ্গুলিহেলন-এর মুখ থেকে আগলে রাখেন শৈশবকে। আড়মাডিলোর মাংস খাওয়া উপজাতির মূর্তিটা সাত্যকি হাতে পাওয়ার পরেই বাবা যখন সভ্যতার সবচেয়ে 'শ্লীল' শব্দ 'থ্যাঙ্কিউ' বলতে শেখায়, ঠিক তখনই মনমোহন বাধা দিয়ে শৈশবের হাসিতে স্নান করে নেন ঝুঁকে পড়ে।[৭]

এ প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক আরো জানাচ্ছেন -

'সন্দেশের জন্য শুনেছি সত্যজিতের নিয়মিত যোগাযোগ ছিল ছোটদের সঙ্গে। মূলত চিঠির মাধ্যমে। তাঁর নিজের কথায় আলাদা করে সময় বাঁধা থাকত সারাদিনের হাজারো ব্যস্ততায় ... মূলত সন্দেশ অধ্যায়কে পরখ করে দেখলেই বোঝা যায় ছেলেবেলার প্রতি সত্যজিতের অপার অকিঞ্চন। উপেন্দ্রকিশোর সুকুমারদের লিগ্যাসি ফেরানোর তাড়নার চাইতেও সন্দেশের দ্বিতীয়বারের আত্মপ্রকাশ ছিল স্বাধীনতা উত্তর বাংলায় ছেলেবেলাকে নতুন করে চারিয়ে দেওয়া।'[৮]

কলকাতার সাংস্কৃতিক আভিজাত্যের আরেক পীঠস্থান গুহঠাকুরতা বাড়ি, সেই বাড়ির ছেলে অর্জুন গুহঠাকুরতা (সত্যজিৎ-বিজয়ার নিকটাত্মীয়া তথা উপমহাদেশের অন্যতম অভিনেত্রী ও সংগীতশিল্পী রুমা গুহঠাকুরতার দেওরের ছেলে) অভিনয় করেছিল পিকুর ভূমিকায়। পরিচালকের সঙ্গে এই শিশু-অভিনেতার 'ভাব জমানো' দেখে সত্যজিৎ-জায়া 'অবাক' হয়ে ভেবেছেন -

'ওঁর ওই লম্বা দেহ, গুরু-গম্ভীর গলার আওয়াজ, তবু কোনও শিশু কোনওদিন ওঁকে ভয় পেত না। উনি ওদের সঙ্গে এমন ভাবে মিশতেন যে, শিশুরা ওঁকে নিজেদের বন্ধু বলে মেনে নিত।[৯]

তবে শিশুচরিত্রটিকে মাঝে রেখে ছবিটি বানানো হলেও কাহিনির মূল সংকট তৈরি হয়েছে পিকুর মা ও মায়ের অবৈধ প্রণয় নিয়ে। গল্প থেকে চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে বেশ কিছু বিষয় বাদ দিয়ে মূলত মায়ের বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কটিকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। পিকুর দাদার প্রসঙ্গে ক্যামেরায় সেভাবে আনেননি। একইভাবে রাজনৈতিক পটভূমি - উত্তাল সত্তরকে আশি সালের শর্টফিল্মে আর ধরেননি সত্যজিৎ। হয়তো কলেজে-পড়া ছেলের মায়ের বিবাহ বহির্ভূত প্রেম টিভি চ্যানেলে সেভাবে গ্রহণযোগ্যতা পেতো কিনা এই নিয়ে পরিচালকের মনেও হয়ত সংশয় ছিল। পিকুর স্কুল ছুটির কারণও গল্প এবং ছবিতে ভিন্ন; গল্পের কারণ ছিল স্ট্রাইক কিন্তু ছবিতে বোর্ডের পরীক্ষায় পিকুর স্কুলের ছাত্রের 'স্ট্যান্ড' করার উল্লেখ আছে।

মায়ের চরিত্র সীমা (যদিও গল্পে নামটি নেই) - যে ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন অপর্ণা সেন; তার আগেই অবশ্য 'তিন কন্যা'য় 'সমাপ্তি'র মৃণ্ময়ী ছাড়াও 'অরণ্যের দিনরাত্রি' ও 'জনঅরণ্য'-এ সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় তাঁকে সত্যজিতের ছবিতে পেয়েছি। এক সময় 'ঘরে বাইরে'র বিমলার ভূমিকাতেও তো অপর্ণার কথা ভেবেছিলেন সত্যজিৎ রায় (অবশ্য অপর্ণা ছাড়াও সত্যজিতের 'ঘরে বাইরে'র নায়িকা-ভাবনায় মাধবী মুখোপাধ্যায়, সুচিত্রা সেন, শর্মিলা ঠাকুর অনেকের নামই এসেছিল) এবং শেষ পর্যন্ত তা বাস্তবায়িত না হওয়ায় 'রীনা'র একটু 'অভিমানই হয়েছিল 'মানিককাকার ওপর'। এক্ষেত্রেও পিকুর মায়ের চরিত্রে প্রথমে যাকে নির্বাচন করা হয়েছিল তাঁর অসুস্থতার কারণেই ওই ভূমিকায় অভিনয় করেন অপর্ণা সেন। চরিত্রটি সংসারী হয়েও ব্যভিচারিণী, স্বামীর জামার বোতাম সেলাই করা, ধোপাকে কাপড়-জামা কাচতে দেওয়া,

অসুস্থ শ্বশুরমশায়ের মুখে পথ্যি তুলে দিয়েও যে স্বামীর অনুপস্থিতিতে 'বয়ফ্রেন্ড'কে বাড়িতে ডেকে শোবার ঘরে দরজা দেয়, শিশুপুত্রকে কৌশলে বাগানে পাঠায় রংবেরঙের ফুলের ছবি আঁকতে।

শর্টফিল্মে 'ঘটনার ঘনঘটা' বা 'বর্ণনার ছটা' রাখেননি পরিচালক। গল্পে পিকুর মা এবং হিতেশের নিউমার্কেটে যাওয়ার ঘটনাটি ছবিতে বাদ দিয়েছেন পরিচালক। এর কারণ ফিল্মে তিনি একটি দিনের কয়েক ঘন্টাকে ধরতে চেয়েছিলেন। মাত্র সাড়ে ২৪ মিনিটের ছবিতে ঘটনার পরিমাণ বাড়ালে সমস্যা হতো ছবি 'ডিটেলিং'-এ। গল্পে একটা বড় প্যারাগ্রাফ জুড়ে পার্টির (পিকুর লেখায় 'পারটি') বর্ণনা ছিল, যেখানে বাঙালি ছাড়াও ইংরেজ-শিখ, সবার আনাগোনা। মেয়েরা বাথরুমে গিয়ে বার বার সাজগোজ করে। সবাই মদ্যপান করে, কেউ বা তজ্জনিত কারণে বমি করেও ভাসায়। সবই শিশু পিকুর চোখে দেখা। সেই মদের বোতল ধুয়েই আবার ফ্রিজে ঠান্ডা জল রাখা হয়। আসলে গল্পের সব কথাগুলি পিকুর লেখা, আর ছবির সব দৃশ্য কিন্তু পিকুর দেখা নয়। এখানেই কিন্তু কলমের সঙ্গে ক্যামেরার দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য তৈরি করেছেন পরিচালক। বাবা-মায়ের ইংরেজি ঝগড়ার আড়ালে যে কথা পিকুর অগোচরে থাকে ছবিতে তো তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, পিকুর বাবা (অভিনয়ে শোভেন লাহিড়ী) বালিশে হিতেশের (অভিনয়ে ভিক্টর ব্যানার্জি) চুল দেখে স্ত্রীর 'বয়ফ্রেন্ডে'র অস্তিত্ব সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে। বাড়ির ধোপার উপস্থিতিতে সেই নিয়ে কটাক্ষ করতেও ছাড়ে না স্ত্রীকে। ছবির সেই দৃশ্যে কিন্তু পিকুর উপস্থিতি নেই। যদিও দাদুর (পিকুর দাদুর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন প্রমোদ গঙ্গোপাধ্যায় - 'শাখা প্রশাখা' ছবিতেও যিনি একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন) কাছে মা-বাবার ইংরেজি ঝগড়ার কথা বলেছে সে। কিন্তু স্বামী- স্ত্রীর সরাসরি আলাপ ও বিশ্বাসহীনতার জায়গাটি ফিল্মে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। গল্পে দেখেছি পিকুর বাবা নিজের অনুপস্থিতিতে বাড়িতে ফোন করে স্ত্রীর অবস্থানের খোঁজ নেয়, ছবিতে অবশ্য তার আর দরকার পড়ে নি।

স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবির গুরুত্বপূর্ণ অংশে শয্যাদৃশ্য - এখানেই ছবির বিষয় নিয়ে একটি বড় প্রশ্ন তোলার জায়গা রয়েছে। সেটা হল বাড়িতে প্রেমিকের আগমন কি শুধুই যৌন মিলনের কারণে? ছেলের ছুটির কথা শুনে পিকুর বাবার মন্তব্য 'তাহলে তো তোমার অসুবিধা বল? তোমার বয়ফ্রেন্ড আসছে না আজকে?' কিংবা ওই একই পরিস্থিতির কারণে ফোনালাপ হিতেশের সংলাপ 'তাহলে আমি কি আসবো না?' অথবা প্রেমিকের শ্বশুরবাড়ির ড্রয়িংরুমে বসে প্রেমিকের উক্তি 'আমরা কি আজ এখানেই বসে থাকব?' -- এগুলি তো দেহনির্ভর সম্পর্কেরই আভাস দেয়। পিকুর মা ছেলেকে কোনোভাবে বাগানে পাঠিয়ে হিতেশের সঙ্গে শোবার ঘরে যায়। বালিশে চুল পড়ে থাকার ঘটনা পুনঃরায় না ঘটার জন্য বালিশে পেতে দেয় তোয়ালে। আর বাগানে ছেলেকে দেখে মায়ের মন ক্ষণিকের জন্য দ্বিধায় সজল হলেও প্রেমিকের প্রতাপে বিছানায় যেতেই হয়। যে শয্যাদৃশ্যের অবতারণা করেছিলেন পরিচালক তাও হয়তো গত শতকের আশি সালে বাংলা দূরদর্শনের টেলিছবি হলে সম্ভব হতো না। ফ্রেঞ্চ টিভি বলেই তা দেখানো হয়েছিল, এমনটা ধরে নেওয়া যায়। শ্রেয় আর প্রেয়র দ্বন্দ্বে মথিত পিকুর মা, বিশিষ্ট অভিনেত্রী তথা বলিষ্ঠ পরিচালক অপর্ণা সেন সেই ভূমিকায় অনবদ্য। আর এ ভূমিকায় তাঁর বোধটুকু যে কতখানি গভীর সে প্রমাণ পাওয়া যাবে চার বছর পরে অপর্ণা সেনের নিজের পরিচালনায় মুক্তি প্রাপ্ত ছবি 'পরমা'র বিষয় দেখে। সেখানে চল্লিশোর্ধ পরমার (নাম ভূমিকায় রাখী গুলজার) সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল তরুণ ছবিওয়ালা রাহুলের (অভিনয়ে মুকুল শর্মা)। 'পরমা'য় কিন্তু পরিচালক অপর্ণা নায়িকাকে 'ব্যাভিচারিণী' পরিচয়ে তুলে ধরেননি বরং নারী স্বাধীনতার এক মাইলস্টোন হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন পরমার সেই সংলাপ 'আমার তো কোন অপরাধবোধ নেই'। ব্যস্ত বহুগামী স্বামী (অভিনয়ে দীপঙ্কর দে), কলেজে পড়া মেয়ে (অভিনয়ে চৈতী ঘোষাল), স্কুলে পড়া ছেলে, শান্ত-ধীর-স্থির শাশুড়ি (অভিনয়ে সন্ধ্যারানী) --এসবের মাঝে রাহুলের কাছে গিয়েই যেন পরমা চিনেছিল নিজেকে, ব্যর্থ প্রেমে উন্মাদিনী সুধা পিসির বদ্ধ ঘরে সাহসী যুবকের অতর্কিত চুম্বন সেদিন পরমার রুদ্ধজীবনের বেড়া দিয়েছিল ভেঙে। 'পিকু' এবং 'পরমা' ছবি দুটি প্রসঙ্গে ২০১৯ সালে নন্দিতা দত্ত লিখেছিলেন এভাবে –

> 'Going back to Pikoo, Aparna later confessed in an interview that she found it very difficult to cry in the film because she didn't feel the tears were justified. She felt that Ray had been very unsympathetic to the mother. 'I think Pikoo is a beautiful film, but the attitude towards the parents is judgemental,' she said, On the other land, Ray proclaimed in an interview that one of the statements that Pikoo was trying to make was that if a woman is to be unfaithful, she has to be ruthless. She cannot afford to be tender to her child.
>
> When Aparna directed her second film, Paroma, in 1984m, adultery was still a taboo in Indian cinema. Even when it was dealt with, the stories revolved around philandering men and their suffering wives. The husband eventually saw reason and returned to his wife. If a woman walked out on her adulterous husband, the film was labelled as 'bold'. Then Paroma came and revolutionized the treatment of adultery in Indian cinema. In this film, a

> middleaged Bengali woman, steeped in domesticity, crossed the threshold of her perfectly stable middle-class home in the quest for romantic love. The Seema of Ray's Pikoo, who felt she had got the raw end the deal, shocked the audiences by treating her 'wayward' Paroma with love and compassion: it was the story of a woman told sympathetically by another woman without dehumanizing her or letting moral righteousness tear into the fabric of the film.'[১০]

অপর্ণার পরমা মেয়েদের জীবনের পরম সত্যটুকু চিনে নিয়েছিল আর সত্যজিৎ পিকুর মা সীমাকে শ্রেয়বোধের সীমানা অতিক্রমের জন্য অপরাধিনী হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন।

গল্পে শেষে পিকুর মা বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে এমন পরিস্থিতির কথা পিকুর বক্তব্যে পেয়েছি। ছবিতে তা নেই। ছবির পরিণতি ট্রাজিক। সীমা বাড়িতে ছেলের উপস্থিতির কারণে প্রেমিকের ক্ষোভের সম্মুখীন হয়েছে, 'সরি'ও বলেছে। তবু হিতেশের ক্রুর প্রতিক্রিয়া -- 'তোমার পরিষ্কার বলে দেওয়া উচিত ছিল আজ হবে না, আজ এসো না, আজ অসুবিধা আছে, ... আজ খুব শিক্ষা হয়েছে আমার।' বাইরে থেকে পিকুর ছদ্ম হুঙ্কারে হিতেশের কথা আর এগোয়নি। কিন্তু পরিচালক সত্যজিৎ প্রাণহীন পরকীয়ার বাস্তব রূপ দেখালেন এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে। ছবি শেষে পিকুর দাদুর মৃত্যু। পরকীয়ায় মত্ত পুত্রবধূ আঁচও করতে পারেনি, ধরেই নিয়েছিল রোগী 'ভালর দিকে'। গল্পে পিকুর জবানিতে বিষয়টি ছিল, এরকম, দাদুর ঘন্টার শব্দ শুনে পিকু চারটে থুথু ফেলে যাওয়ার পর -- 'গিয়ে দেখি চুপচাপ দাদু শুয়ে আছে আর কিন্তু ঘুমোচ্ছে না তাই বল্লাম দাদু কি বেপার কিন্তু দাদু কিছু বলল না খালি উপরের দিকে চেয়ে দেখছে, পাখাটির ঊসা ফ্যানটার দিকে ...' সিনেমায় দাদুর পালস্ দেখছে পিকু, আগেই দাদু নাতিকে হার্ট আর পালসের অবস্থান বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। দাদুর চলে যাওয়া ফিল্মের পিকু ঠিকই বুঝে নিয়েছিল। বাড়ির একমাত্র কাছের মানুষের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতার আঁচটুকু পেয়ে বাচ্চাটির চোখের নিঃসঙ্গতার বেদনাই ঝরেছে।

ভালো করে খেয়াল করলে দেখা যাবে সত্যজিৎ রায়ের আশির দশকের ছবিগুলি নিঃসঙ্গতার কথাই বলে, বিচ্ছিন্নতার সুর শোনা যায় সেখানে -- পরিচালক অবশ্য তার বিপ্রতীপেই যাত্রা করতে চান। যদি রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে'র নিখিলেশকে বাদও দিই (মেজোরানীর পাশে বিমলাকেও কি নিঃসঙ্গও মনে হয় না?), সত্যজিতের নিজের কাহিনি নিয়ে তৈরি 'শাখা-প্রশাখা'র 'মেজ'ভাই প্রশান্ত বা তাদের বাবা কিংবা 'আগন্তুকে' মনমোহন -- এঁরা তো কেউই কপট সমাজের সঙ্গে মিশে যেতে পারেননি। ইবসেনের 'এনিমি অফ দ্য পিপল' অবলম্বনে তৈরি 'গণশত্রু'তেও ডাক্তার অশোক গুপ্ত বা তার পরিবার বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল সমাজ থেকে; শুধু সত্য ও সততাকে ছাড়তে পারেনি কিংবা অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করতে পারেনি বলেই। 'পিকু'তে অত বৃহত্তর পটভূমিতে না থাকলেও সমাজ-পরিবারের দুষ্টক্ষতর মাঝে এক নির্মল ফুলের মতোই আনন্দ-বেদনা দিয়ে ছেলেটিকে গড়ে তুলেছিলেন সত্যজিৎ রায় -- তাঁর গল্পে এবং ছবিতেও।

সূত্র-সংকেতঃ

১. *'উৎসব' ছবির দৃশ্য থেকে সংলাপগুলি সংগৃহীত*

২. *বিজয়া রায়, 'আমাদের কথা', আনন্দ, কলকাতা, নবম মুদ্রণ, ২০১৭, পৃ ৪১৭*

৩. *স্যমন্তক চট্টোপাধ্যায়, 'সত্যজিৎ রায়ঃ চিত্রনাট্য প্রসঙ্গয়' প্রবন্ধ), 'বিচিত্রপত্র', বৈশাখ- ১৪২৬, পৃ ৪২*

৪. *তদেব, পৃ ৪৩*

৫. *বিজয়া রায়, 'আমাদের কথা', প্রাগুক্ত, পৃ ৪১৭*

৬. *তদেব, পৃ ৪১৮*

৭. *সৌকর্য ঘোষাল, 'সত্যজিতের শিশুমানস' (প্রবন্ধ), 'বিচিত্রপত্র', শারদীয়া প্রবন্ধবার্ষিকী, ১৪২৮, পৃ ৯৩*

৮. *তদেব. পৃ ৯৩*

৯. *বিজয়া রায়, 'আমাদের কথা', প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৭*

১০. *Nandita Dutta, 'Does women's liberation mean adultery? How Aparna Sen differed from Satyajit Ray' (article), 'The Print', 21.07.2019*

সত্যজিতের সায়েন্স ফিকশন ঃ মূল্যবোধের বিজ্ঞান

ড. ভাস্কর খাঁড়া

[**বিষয়-চুম্বক** ঃ *প্রফেসর শঙ্কু সত্যজিৎ রায়ের অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। ৩৮টি সায়েন্স ফিকশন-ধর্মী কাহিনি তিনি রচনা করেছেন শঙ্কুকে প্রধান চরিত্রে রেখে। কিন্তু সত্যজিতের সায়েন্স ফিকশন নিছক কল্পনার বিস্তারের সাহায্যে বৈজ্ঞানিক সম্ভাবনাকে তুলে ধরেছে এমনটি নয়। গল্পগুলির মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে ন্যায়-অন্যায়, নৈতিক-অনৈতিক, শুভ-অশুভের নিরন্তর এক দ্বন্দ্ব যে দ্বন্দ্ব একান্ত ভাবেই মানবিক। সময় আসে যখন বিজ্ঞানীকে মানব সমাজের কল্যাণে অবশ্যই পক্ষ নির্বাচন করতে হয়। মূল্যবোধ-হীন বিজ্ঞানচর্চা মানব সভ্যতাকে সংকটের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিতে পারে। প্রফেসর শঙ্কু নিজের বৈজ্ঞানিক-জীবনে যখনই নৈতিক সংকটের মুখোমুখি হয়েছেন তিনি অবশ্যই শুভ, মঙ্গল, নৈতিকতার পক্ষ নিয়েছেন।*

সূচক-শব্দ : *সায়েন্স ফিকশন, প্রফেসর শঙ্কু, বিজ্ঞানীর নৈতিক সংকট, মূল্যবোধের জয়, অসাধু বিজ্ঞানী*]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কয়েক দশক পরের ঘটনা। বিজ্ঞানী বন্ধু জেরেমি সান্ডার্সের ডাকে তড়িঘড়ি জার্মানিতে এসেছেন প্রফেসর শঙ্কু। অষ্টাদশ শতকের বৈজ্ঞানিক ভিক্টর ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের বংশধরের খোঁজ পাওয়া গেছে ইনগোলস্টাট শহরে। ইনি সেই ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন যিনি মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চার করার পরীক্ষায় সফল হয়েছিলেন বলে জনশ্রুতি। সেই বংশধরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে শঙ্কুরা জানতে পারেন ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের গবেষণার যাবতীয় কাগজপত্র, ডায়েরি এমনকি তাঁর ব্যবহৃত পুরোনো ল্যাবরেটরি - যেখানে নাকি মৃত মানুষকে বাঁচিয়ে তোলা হয়েছিল, সেই সবই এই পুরোনো অট্টালিকায় সযত্নে রক্ষিত আছে। কালের চক্রকে পিছনে ঠেলে শঙ্কুরা সেই গবেষণাগারে আবার বাঁচিয়ে তুললেন মৃত ক্যানসার বিশেষজ্ঞ ডাঃ টমাস গিলেটকে। কিন্তু জার্মানির রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তখন আবার ঘনিয়ে উঠছে বিপদের সিঁদুরে মেঘ। উত্থান ঘটছে হিটলার-পন্থী নেতা হানস রেডেল-এর। তাঁর দল আবার ছড়িয়ে দিচ্ছে ইহুদি-বিদ্বেষ। শঙ্কুরা জার্মানিতে থাকাকালীন রেডেল হঠাৎ মারা যান থ্রম্বোসিসে। উগ্র রেডেল-পন্থীরা বন্দুকের নলের সামনে শঙ্কুদের বাধ্য করলেন মৃত রেডেলকে বাঁচিয়ে তুলতে। কিন্তু হিটলারের কার্যকলাপের স্মৃতি থেকে শঙ্কু অনুভব করেছিলেন, রেডেলকে বাঁচিয়ে তুললে সমগ্র বিশ্বে সংকট তৈরি হবে। তাই বাঁচিয়ে তোলার সেই প্রক্রিয়ায় তিনি গোপনে রেডেলের মস্তিষ্কে অন্য এক মানুষের ব্রেন প্রতিস্থাপন করলেন। রেডেল বেঁচে উঠলেন ঠিকই। কিন্তু তিনি এখন সম্পূর্ণ অন্য এক মানুষ। সভ্যতা মুক্ত হল আসন্ন এক মহা-সংকট থেকে।

১৩৯৫ বঙ্গাব্দের আনন্দমেলা পূজাবার্ষিকীতে প্রকাশিত হল 'শঙ্কু ও ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন' নামক এই সায়েন্স ফিকশন।[১] শঙ্কু-সিরিজের প্রায় শেষের দিকে লেখা হয় এই গল্পটি। প্রফেসর শঙ্কুকে নিয়ে এরপর আর মাত্র তিনটি গল্প লিখবেন সত্যজিৎ রায়। বিজ্ঞানী শঙ্কু নিজের বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে এভাবেই পৃথিবীকে বিপদ-মুক্ত করেছিলেন। মানবতার সঙ্গে আদিম হিংস্র পাশবিকতার দ্বন্দ্বে বলাই বাহুল্য তিনি মানবিকতার পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। মাত্র কয়েক দশক আগেই যে হিটলারের বিদ্বেষের বলি হয়েছিলেন তিরিশ-চল্লিশ লক্ষ ইহুদি, সেই হিটলার-পন্থী নতুন নেতা রেডেলের মস্তিষ্কে তিনি পুরে দিয়েছিলেন এমন একজনের ব্রেন যিনি আক্ষরিক অর্থেই বিদ্বেষহীন মানবতার সমর্থক। প্রফেসর শঙ্কুর এই সিদ্ধান্ত কিন্তু আকস্মিক নয়। প্রফেসর শঙ্কুকে নিয়ে মোট যে আটত্রিশটি পূর্ণাঙ্গ কাহিনি সত্যজিৎ রায় রচনা করেছিলেন, সেই কাহিনিগুলির যেখানেই এই রকম শুভ-অশুভ, নৈতিক-অনৈতিক কিংবা ন্যায়-অন্যায়ের দ্বন্দ্ব ঘনিয়ে উঠেছে শঙ্কু অবশ্যই মানব কল্যাণের পক্ষ নিয়েছেন।

Dr. Bhaskar Khanra, Assistant Professor, Dept. of Bengali, Bagnan College, Howrah

প্রফেসর শঙ্কুর চরিত্র সত্যজিৎ রায় প্রথম সৃষ্টি করেছিলেন ১৯৬১ সালে।[২] তখন তাঁর বয়স চল্লিশ বছর। সেই বছর নতুন করে সন্দেশ পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছেন তিনি আর সুভাষ মুখোপাধ্যায়। সেই পত্রিকার প্রয়োজনেই তিনি লিখলেন তাঁর প্রথম মৌলিক গল্প 'ব্যোমযাত্রীর ডায়রি'। প্রকাশিত হল এই পত্রিকারই ষষ্ঠ থেকে অষ্টম সংখ্যায়। প্রফেসর ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কুর মঙ্গল গ্রহ অভিযান এবং তারপর সেখান থেকে টাফা গ্রহে পদার্পণ এই গল্পের মূল বিষয়। অর্থাৎ প্রথম গল্পেই তিনি বিষয় হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন সায়েন্স ফিকশনের এক অন্যতম জনপ্রিয় থিম ভিন্ গ্রহে অভিযান ও সেখানকার প্রাণীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ। 'সন্দেশ' পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয় তাঁর পরবর্তী দুটি ছোটগল্প 'বঙ্কুবাবুর বন্ধু' ও 'টেরোড্যাকটিলের ডিম'। চরিত্রগত ভাবে এই গল্প দুটিকেও সায়েন্স ফিকশনের পর্যায়ে ফেলা চলে। যদিও এই গল্পদুটি প্রফেসর শঙ্কু সিরিজের নয়। বঙ্কুবাবুর বন্ধু গল্পে এবার ভিনগ্রহের প্রাণী পথ ভুল করে এসে হাজির হয়েছে পৃথিবীতে। ক্রেনিয়াস গ্রহের অ্যাং - যে তার মহাকাশ যান নিয়ে বেরিয়েছিল প্লুটো থেকে একটু ঘুরে আসবে বলে, যন্ত্রপাতির গন্ডগোলে মহাকাশযান সহ সে এসে পৌঁছায় পঞ্চা ঘোষের বাঁশবাগানে। সেখানেই তার সঙ্গে দেখা হয় নিরীহ মাস্টারমশাই বঙ্কুবাবুর। আসলে যে অ্যাং এসেছিল হীনমন্যতায় ভোগা বঙ্কুবাবুর মনে সাহস জোগাতে গল্পের শেষে সেই সন্দেহ আর থাকে না। 'টেরোড্যাকটিলের ডিম' গল্পে রয়েছে টাইম মেশিনের প্রসঙ্গ যা গল্পটিকে সায়েন্স ফিকশনের মাত্রা দিয়েছে। পরে দেখা গেছে টাইম মেশিনের উদ্ভাবক পরিচয় দিয়ে যে লোকটি অফিস-ফেরত বদনবাবুকে কাল-পর্যটনের বিচিত্র সব গল্প শুনিয়েছে সে আসলে সঙ্গে করে নিয়ে গেছে বদনবাবুর মানি-ব্যাগটি। শঙ্কু সিরিজের গল্পগুলি ছাড়াও এরকম প্রায় দশ-বারোটি সায়েন্স ফিকশনধর্মী কাহিনি লিখেছেন সত্যজিৎ রায়। যেমন অঙ্ক স্যার গোলাপীবাবু ও টিপু, সেপ্টোপাসের খিদে, প্রফেসর হিজিবিজবিজ, ম্যাকেঞ্জি ফ্রুট, ময়ূরকণ্ঠী জেলি, অসমঞ্জবাবুর কুকুর। আর প্রফেসর ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কুকে মূল চরিত্র রেখে তিনি পরবর্তী কালে মোট ৩৮টি পূর্ণাঙ্গ সায়েন্স ফিকশন রচনা করবেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র[৩], হেমেন্দ্রকুমার রায়[৪], ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য[৫]-র পরে সত্যজিৎ রায়ই বাংলা ভাষায় সায়েন্স ফিকশনের ধারাবাহিক চর্চা করেছেন দীর্ঘ প্রায় চল্লিশ বছরের সময়পর্বে।

বিজ্ঞানীর ব্যক্তিগত নৈতিকতা ও মূল্যবোধের সংকট সায়েন্স ফিকশনকে দিতে পারে এক অনন্য মাত্রা। বস্তুত এই সংকটের প্রকাশ ব্যতিরেকে সায়েন্স ফিকশন হয়ে উঠতে পারে নিছক অলীক কল্পনা। বিশ্বের প্রথম সায়েন্স ফিকশন হিসাবে বিবেচিত হয় যে রচনাটি, সেই মেরি শেলীর লেখা[৬] 'ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন অর দি মডার্ন প্রমিথিউস' কাহিনিটিতেও রয়েছে বিজ্ঞানী ভিক্টর ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের আত্মিক সংকট। সত্যজিতের শঙ্কুর গল্পগুলির সঙ্গেও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে রয়েছে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের বিষয়টি। এই নৈতিকতা অবশ্যই বিজ্ঞানের সম্ভাবনা ও তার অপপ্রয়োগের বাস্তব উদাহরণ থেকে জাত। বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও তার ক্রমবর্ধমান ক্ষমতার সঙ্গে মানব চৈতন্যের সংঘাত একজন সচেতন বিজ্ঞান সাধকের মধ্যে থাকা জরুরি। ন্যায়-অন্যায় বোধ বিরহিত একজন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী রাক্ষসের তুল্য সর্বগ্রাসী। বৈজ্ঞানিকের যাত্রা এক সরু সুতোর উপর দিয়ে। তাঁর ভারসাম্য বিচলিত হলে টলে উঠবে সভ্যতার ভারসাম্য।

যেমন 'হিপনোজেন' গল্পের আলেকজাণ্ডার ক্রাগ। অমরত্ব তার লোভ। পৃথিবীর উপর কর্তৃত্ব করার বাসনা তার স্বপ্ন। একজন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী তিনি। তৈরি করেছেন ওডিন ও থরের মতো নিপুণ দুটি রোবট। আবিষ্কার করেছেন হিংস্র প্রাণীকে বশীভূত করে রাখার কৌশল। কিন্তু তাঁর বৈজ্ঞানিক সিদ্ধির কাছে এগুলি কিছুই নয়। বর্তমানে এই বিজ্ঞানীর বয়স দেড়শ বছর। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সাহায্যে তিনি তিন তিনবার নিশ্চিত মৃত্যু ঠেকিয়ে রেখে নিজের আয়ু বাড়িয়ে নিতে পেরেছেন। কিন্তু তার ওষুধ অনির্দিষ্টকালের জন্য মানুষকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে না। তাই তার অন্তিম অ্যাডভেঞ্চার মৃত্যুকে পরাস্ত করা। দীর্ঘ জীবন লাভের মাধ্যমে তিনি পৃথিবীকে করায়ত্ত করতে চান। মৃত্যুকে পরাস্ত করার যে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া তাও তিনি আবিষ্কার করে ফেলেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর সেই প্রক্রিয়াকে সুচারুভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রফেসর শঙ্কুসহ চার বিজ্ঞানীকে নিজের দুর্গে তিনি বন্দী করেছেন। দেড়শ বছর বেঁচে থেকেও যে মানুষের জীবন তৃষ্ণা মেটে না, সেই মানুষ আসলে সাধারণ বৈশ্বিক নিয়মকে অস্বীকার করতে চায়। সেই মানুষ মানবতার পক্ষে ক্ষতিকর। সিনেমাতেও সত্যজিৎ রায় দেখিয়েছেন এই লোভের এক রূপ। 'গুপি বাঘা ফিরে এলো' সিনেমায় নিজেদের যৌবন ফিরে পাওয়ার লোভে গুপি ও বাঘা তান্ত্রিকের ফাঁদে পা দিয়েছিল। সেই তান্ত্রিকেরও লক্ষ্য ছিল মৃত্যুকে পরাস্ত করা। বিশ্ব-বিধানের নিয়মকে অস্বীকার করতে গিয়ে সেই তান্ত্রিক তৈরি করেছিল নৈরাজ্য। কিন্তু তাতেও সফল হননি শেষ পর্যন্ত। আর সোজা পথ থেকে ভ্রষ্ট হতে গিয়ে গুপি বাঘার কপালে জুটেছিল ভূতের রাজার তিরস্কার : তোরা বাঁকা পথে কেন যাস ? কেন যাস ? কেন যাস ?

বস্তুত প্রফেসর শঙ্কু এই 'বাঁকা পথ'-এর ঘোর বিরোধী। কৈশোরেই প্রফেসর শঙ্কুর মধ্যে সোজা পথের ধারণাটি স্পষ্ট করে

দিয়ে গেছেন তাঁর বাবা ত্রিপুরেশ্বর শঙ্কু। কিন্তু ঘটনাচক্রে বারবার এই বাঁকা পথের পথিক বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকের মুখোমুখি হয়ে যান তিনি। যেমন এক বাঙালি বিজ্ঞানী গজানন তরফদার। অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার কৌশল আবিষ্কারের গবেষণা করছেন তিনি। কিন্তু তার মেধা শঙ্কুর মতো নয়। তাই গজানন এক স্মৃতিধর ম্যাকাও পাখিকে ব্যবহার করেন শঙ্কুর আবিষ্কারের কৌশল চুরি জন্য। সে কাজে প্রাথমিক ভাবে সফলও হন। কিন্তু শেষ রক্ষা হয় না। 'শঙ্কু ও আদিম মানুষ' গল্পটিতেও আছেন এই রকম বাঁকা পথের যাত্রী এক বিজ্ঞানী। প্রফেসর হাইনরিখ ক্লাইন মানব বিবর্তনের উপর গবেষণা করছিলেন। তিনি তৈরি করেছিলেন এমন এক ওষুধ যা ইঞ্জেক্ট করলে মানুষ বিবর্তনের পথে পিছিয়ে যেত। সেই ওষুধ তিনি জোর করে রিভলভার দেখিয়ে প্রয়োগ করেছিলেন তারই সহ বিজ্ঞানী হেরমান বুশ-এর উপর। যার ফলে হেরমান বুশ বিবর্তনের ধারায় পিছিয়ে গিয়ে এক আদিম মানুষে পরিণত হন। শঙ্কুও মানব-বিবর্তনের উপর গবেষণা করে আবিষ্কার করেছিলেন এভিলিউটিন নামের এক ওষুধ - যা বিবর্তনের পথে মানবকে সামনের দিকে এগিয়ে দেবে। এভিলিউটিন প্রয়োগ করে হেরমান বুশকে বর্তমান চেহারায় শঙ্কু ফিরিয়ে এনেছেন বটে। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি অনুভব করেছেন এই ধরণের গবেষণার বিপদের দিকটি। বুঝেছেন, বিবর্তন নিয়ে বেশি কৌতূহল প্রকাশ না করাই ভালো। যা হচ্ছে তা আপনা থেকে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। সভ্যতার নিয়মকে অনাবশ্যক ব্যাহত করলে তা কল্যাণকর হতে পারে না। তাই এই গবেষণা সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করেছেন শঙ্কু। আলেকজাণ্ডার ক্রাগ, গজানন তরফদার বা হাইনরিখ ক্লাইন - অসাধু বিজ্ঞনীর তালিকা সত্যজিতের গল্পে কম নয়। আছেন, প্রফেসর লুইজি রন্ডি (প্রফেসর রন্ডির টাইম মেশিন) প্রফেসর হামবোল্ট (আশ্চর্য প্রাণী) প্রফেসর কারবোনি (প্রফেসর শঙ্কু ও উই এফ ও) উইঙ্গফিল্ড (কম্পু), বিজ্ঞানী গ্রোপিয়াস (শঙ্কুর শনির দশা)। নামের তালিকা দীর্ঘ হতেই থাকবে।

আর এই ধরনের নিদর্শন রয়েছে বলেই কল্পবিজ্ঞানের কাহিনি হয়েও শঙ্কুর ডায়েরিগুলি ধারণ করে রয়েছে কিছু গুরুত্বপূর্ণ জীবনদর্শন। বিজ্ঞান যত সূক্ষ্ম হয়ে উঠেছে, সভ্যতার সংকট-সম্ভাবনাও হয়ে উঠেছে তত তীব্র। মানব সভ্যতার সংকট বেশিরভাগ সময়েই ঘনিয়ে এসেছে মানুষের অপরিসীম লোভের কারণে। বিজ্ঞানের অগ্রগতি যত হবে মানুষ কি হারিয়ে ফেলবে তার শিকড়, তার মানবতা? বিজ্ঞান ব্যবহৃত হবে অনগ্রসরকে অত্যাচারের হাতিয়ার হিসাবে? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পারমাণবিক বিস্ফোরণ বিজ্ঞানের যাবতীয় গরিমাকে ধূলোয় মিশিয়ে দিয়েছিল। তাই কি এই সময়ের সায়েন্স ফিকশন মূল প্রশ্ন হিসাবে বেশি করে উঠে এলো মূল্যবোধের বিষয়টি? মহাজাগতিক কিংবা ইন্টারস্টেলার অভিযানে গিয়ে ভিন গ্রহের প্রজাতির সঙ্গে আলাপের থিমেও[৭] এখন উঠে আসছে মানুষের মূল্যবোধের প্রশ্নটি। বিজ্ঞানের শক্তিকে কোন কাজে ব্যবহার করা হবে তা মূল্যবোধ ও নৈতিকতার প্রশ্ন। 'মুক্তধারা' নাটকে যন্ত্ররাজ বিভূতি বিজ্ঞানের অমিত শক্তিকে কাজে লাগিয়ে তৈরি করেছিলেন অভ্রভেদী লৌহযন্ত্র - একটি বাঁধ। রাষ্ট্রক্ষমতা সেই যন্ত্রকে কাজে লাগিয়েছিল শিবতরাইয়ের প্রজাদের নিজেদের অনুগত রাখতে। তাদের তৃষ্ণার জলের কর্তৃত্ব নিয়েছিল নিজের হাতে। একটু খেয়াল রাখলেই বোঝা যাবে প্রফেসর শঙ্কু কোনও রাষ্ট্র বা কোনও প্রতিষ্ঠানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নন। তিনি এক স্বাধীন বিজ্ঞানী। নিজের ল্যাবরেটরিতে বসে নিজের মেধা ও স্বল্প সামর্থ্যকে কাজে লাগিয়ে তিনি আবিষ্কারের আনন্দে মত্ত থাকেন। সেই আবিষ্কারের মধ্যে চাঁদে যাওয়ার রকেট কিংবা বিবিধ কাজে সমর্থ রোবোটের মত বড় বড় জিনিস রয়েছে, রয়েছে মিরাকিউরল নামক সর্বরোগহর ওষুধ, নিওস্পেক্ট্রোস্কোপ নামক ভূত দেখার যন্ত্র, নস্যাস্ত্র বা জৃম্ভণাস্ত্র নামক হাঁচিয়ে মারা বা হাই তুলিয়ে কুপোকাত করার অস্ত্র তেমনি রয়েছে অ্যানাইহিলিন নামক সাংঘাতিক অস্ত্র যা মুহূর্তের মধ্যে শত্রুকে 'নিশ্চিহ্ন' করে। রাষ্ট্র বা প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতা নেন না বলেই শঙ্কুর আর্থিক সামর্থ্য কম। চারপাশের সুলভ উপাদান দিয়েই তিনি তার যন্ত্রপাতি ও ওষুধ তৈরি করেন। ফলে তার আবিষ্কৃত জিনিসের উৎপাদন মূল্যও খুব কম। যেমন চাঁদে যাওয়ার জন্য রকেট তৈরির উপাদান হিসাবে তিনি ব্যবহার করেছেন ব্যাঙের ছাতা, সাপের খোলস আর কচ্ছপের ডিমের খোলা মিশিয়ে তৈরি একটি কম্পাউন্ড। যে রোবট তৈরি করতে ইউরোপের বিজ্ঞানীরা হাজার হাজার পাউন্ড খরচ করেন, শঙ্কু তার থেকে ভালো রোবট তৈরি করেছেন মাত্র তিনশো তেত্রিশ টাকা সাড়ে সাত আনায়। বট ফল দিয়ে তৈরি করেছেন ক্ষুধানাশক বটিকা ইন্ডিয়া ওষুধ। শঙ্কুর এই সমস্ত আবিষ্কার কিন্তু আমরা জনসমাজে ব্যবহারের কোনও নিদর্শন দেখতে পাই না গল্পগুলির মধ্যে। অর্থাৎ কোনও বাণিজ্যিক উৎপাদন ব্যবস্থার অংশ হয়ে ওঠেননি শঙ্কু। তার আবিষ্কারের উপর অধিকার দাবি করেনি কোনও রাষ্ট্র বা প্রতিষ্ঠান। ভাবা যেতেই পারে মারণাস্ত্র তৈরির কোম্পানিগুলির নির্দেশে বা রাষ্ট্রের নির্দেশে অ্যানাইহিলিন অস্ত্র তৈরি হলে সেই পৃথিবীতে আদৌ কেউ নিরাপদ থাকতেন কিনা! শঙ্কু তার ছোট বড় সমস্ত আবিষ্কার শুধুমাত্র ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যবহার করেছেন। প্রচুর অর্থ উপার্জনের পথে লালায়িত হননি। পৃথিবীজোড়া খ্যাতি পেয়েছেন আবিষ্কারের জন্য কিন্তু সেই আবিষ্কারের বাণিজ্যিক উৎপাদনে উৎসাহ দেখাননি। অনুরোধ এলেও না। যেমন শঙ্কুর রেমেমব্রেন' যন্ত্রের কথা শুনে আমেরিকান ধনকুবের হিরাম হোরেনস্টাইন উপযুক্ত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে নিজের কিছু হারানো স্মৃতি খুঁজে পেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শঙ্কু একটু নরম ভাষায় তাকে লিখে যা জানিয়েছিলেন তার মর্মার্থ হল 'শৌখিন মার্কিন মিলিয়নেয়ারদের

শখ মেটানোর জন্য আমি এ যন্ত্র তৈরি করিনি'। ধনকুবেরদের কাছে যেমন মাথা নোয়াননি, তেমনি হিটলারের সেনাবাহিনির প্রধানের চোখ রাঙানিকেও তাঁকে কৌশলে অগ্রাহ্য করতে দেখি 'স্বর্ণপর্ণী' গল্পে।

আজকের রাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতি নিয়ন্ত্রিত যুগে বিজ্ঞানীকেও রাষ্ট্রনীতির দাসত্ব করতে হয় বলে তার সংকট আরও বেশি তীব্র। রাষ্ট্র এবং বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের আর্থিক আনুকূল্য ছাড়া আজকের যুগে বিজ্ঞান গবেষণা সম্ভব নয়। আর সেই আর্থিক আনুকূল্যের বিনিময় বিজ্ঞনীকে হয়ে উঠতে হয় সিস্টেমের হাতে বন্দি, নৈতিকতা-বর্জিত সত্যের অনুসন্ধানী। প্রশ্ন জাগে, একবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে প্রফেসর শঙ্কু কি আদৌ পারতেন, গিরিডির শান্ত নির্জন পরিবেশে, উস্রি নদীর অদূরবর্তী তাঁর ছিমছাম ল্যাবরেটরিতে নিজের ইচ্ছানুযায়ী বিজ্ঞান সাধনায় মগ্ন থাকতে?

সূত্র-সংকেত ও টীকা:

১. *সায়েন্স ফিকশন (বাংলায় এর বিকল্প হিসাবে 'কল্পবিজ্ঞান' পরিভাষাটি বহুল ব্যবহৃত হয়) তার চরিত্রধর্মে নানা বৈচিত্রের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। বিজ্ঞানের সঙ্গে কল্পনার মিশ্রণ এই ধরনের কাহিনির ভিত্তি। কিন্তু সেই কল্পনা শিকড়-রহিত কিংবা ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা- রহিত নয়। যেমন, মহাকাশে যাত্রা এক সময়ের অলীক কল্পনা হলেও বর্তমানের বাস্তব। বাস্তব সম্ভাবনার উপর ভিত্তি করেই একসময় নির্মিত হয়েছিল সেই কল্পনা। বিজ্ঞান তাকে পরবর্তীকালে বাস্তব করে তুলেছে।*

২. *সত্যজিৎ রায় লেখা শুরু করেছেন ১৯৬১ সালে। তবে বাংলা ভাষায় কল্পবিজ্ঞান রচনার সূত্রপাত ঘটে গিয়েছে ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকেই। কল্পবিজ্ঞান রচয়িতার আদি নাম হিসাবে হেমলাল দত্ত, জগদীশচন্দ্র বসু এবং জগদানন্দ রায়ের নাম উল্লেখ করা যায়। হেমলাল দত্ত সচিত্র বিজ্ঞান দর্পণ পত্রিকায় (১২৮৯ বঙ্গাব্দ/১৮৮২) 'রহস্য' নামে একটি কাহিনি লেখেন। তবে এই কাহিনিটি ঠিক কল্পবিজ্ঞানের কাহিনি বলা যায় কিনা সন্দেহ। লণ্ডনে বন্ধুর বাড়ি গিয়ে তার গৃহের নানারকম বাস্তব বৈজ্ঞানিক প্রয়োগ-কৌশলের কারণে কিভাবে বঙ্গীয় যুবক নাজেহাল হলেন তার কাহিনি এটি। সেই হিসাবে জগদীশচন্দ্র বসুর 'পলাতক তুফান' (১৩০৩ বঙ্গাব্দ) কাহিনিটিতে কল্পবিজ্ঞানের স্বাদ রয়েছে। বিজ্ঞানের সূত্রকে কাজে লাগিয়ে এক অবাস্তব ঘটনার সংঘটন রয়েছে এই কাহিনিতে। হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস ছিল ভয়ানক এক তুফান তটভূমিতে আছড়ে পড়বে। কিন্তু সেই তুফান আর আসেনি। কারণ কাহিনির লেখক সমুদ্রে এক শিশি 'কুন্তল-কেশরী' তেল ঢেলে সেই ভীষণ তুফানের গতিরোধ করেন। তৈল চঞ্চল জলরাশিকে মসৃণ করে - এই বৈজ্ঞানিক সূত্রকে কাজে লাগিয়ে এই অসম্ভবের গল্প-কল্পনা তৈরি হয়েছে। জগদানন্দ রায়ের 'শুক্রভ্রমণ' প্রকাশিত হয় ১৩২১ বঙ্গাব্দে 'প্রাকৃতিকী' গ্রন্থে। যদিও লেখকের নিবেদন থেকে জানা যায় এটি গ্রন্থ প্রকাশের প্রায় বাইশ বছর পূর্বের রচনা। সেই হিসাবে এই রচনা পলাতক তুফানের আগে। এই কাহিনিতে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষায় আগ্রহী দুই বন্ধুর একজন (লেখক) শুক্র ভ্রমণের স্বপ্ন দেখেছেন। স্বপ্ন-কাহিনি হলেও শুক্রগ্রহের বিস্তৃত বর্ণনা, সেখানকার অধিবাসীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ইত্যাদির বিবরণে কল্পবিজ্ঞানের ছোঁয়া আছে। এটা ভুললে চলবে না যে গ্রহান্তরে অভিযানের বিবরণ কল্পবিজ্ঞানের একটি মূল থিম। (দ্র. সিদ্ধার্থ ঘোষ। সায়েন্স ফিকশন। নির্মাল্য আচার্য সম্পাদিত এক্ষণ শারদীয়া সংখ্যা। ১৩৯৫ বঙ্গাব্দে। পৃ ১১৯-১৭৬)*

৩. *বাংলায় প্রথম নিয়মিত কল্পবিজ্ঞান-রচনার চর্চা করেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। কালাপানির অতলে, দুঃস্বপ্নের দ্বীপ, মানুষের প্রতিদ্বন্দ্বী, আকাশের আতঙ্ক, পৃথিবীর শত্রু, মহাকাশের অতিথি, পিঁপড়ে পুরাণ, পাতালে পাঁচ বছর, শুক্রে যারা গিয়েছিল, মনুদ্বাদশ ইত্যাদি বহু উল্লেখযোগ্য সায়েন্স ফিকশন লিখেছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। মহাকাশ যাত্রা, রোবোট, ভিন্ গ্রহের প্রাণী, পারমাণবিক প্রলয়, অদ্ভুত অ্যাডভেঞ্চার ইত্যাদি একাধিক প্রচলিত সায়েন্স ফিকশন থিমের দেখা মেলে তাঁর কাহিনিগুলিতে। কল্পবিজ্ঞান রচনায় তিনি মূলত জুল ভার্ন অনুগামী।*

৪. *প্রেমেন্দ্র মিত্রের পরে বাংলা কল্পবিজ্ঞান রচনায় উল্লেখযোগ্য নাম হলেন হেমেন্দ্রকুমার রায়। কিশোর পাঠ্য অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি রচনায় হেমেন্দ্রকুমার সিদ্ধহস্ত। 'অমানুষিক মানুষ', 'অসম্ভবের দেশে', 'মেঘদূতের মর্ত্যে আগমন', 'ময়নামতীর মায়াকানন' ইত্যাদি তাঁর কল্পবিজ্ঞানমূলক রচনা।*

৫. *ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য কল্পবিজ্ঞান কাহিনি রচনার অন্যতম বিখ্যাত নাম। তাঁর প্রথম বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প 'কাশ্মীরী রহস্য' প্রকাশ পায় রামধনু পত্রিকায় ১৩৩৮ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যায়। প্রেতাত্মার দ্বীপ, অভিশপ্ত গুহা, প্রেতাত্মার উপত্যকা, দানবের দ্বীপ, ঘুমপাড়ানি দ্বীপ, জ্বলন্ত দ্বীপের কাহিনি, প্রফেসর এক্স, ফুটোস্কোপ, রঙ্গিলা পাহাড়ের*

নীলকুঠী, মেঘনাদ, লুপ্তধন, ফিরিঙ্গির গড় ইত্যাদি তার রচিত উল্লেখযোগ্য গল্প। তাঁর লেখায় কোনও চরিত্রের পুনরাবৃত্তি দেখা যায়না। তাঁর বেশিরভাগ গল্পের কথক বা মূল চরিত্র বিজ্ঞানের শাখার মানুষ।

৬. *১৮১৮ সালে মেরি শেলী (কবি শেলীর পত্নী) রচনা করেন' 'ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন, অর দি মর্ডান প্রমিথিউস'। এই রচনাটিকেই বিশ্বসাহিত্যের প্রথম কল্পবিজ্ঞান হিসাবে চিহ্নিত করেছেন অনেকেই। অষ্টাদশ শতকের শেষে মরা ব্যাঙের উপর গ্যালভিনের বৈদ্যুতিক প্রয়োগের পরীক্ষা সাড়া জাগিয়েছিল। বিদ্যুতের প্রয়োগর ফলে মৃত ব্যাঙের পায়ের কম্পন প্রাণ সঞ্চারের লক্ষণ বলে মনে করা হয়েছিল। সেই বৈজ্ঞানিক সম্ভাব্যতার উপর নির্ভর করেই মেরি শেলীর নায়ক ড. ভিক্টর ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন এক মৃতদেহকে বাঁচিয়ে তুললেন। কিন্তু তার মধ্যে জেগে উঠলো এক দানবীয় সত্তা। বিশ্বসাহিত্যে জন্ম নিল প্রথম কল্পবিজ্ঞান কাহিনি ঃ ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন, অর দি মর্ডান প্রমিথিউস।*

৭. *জেমস ক্যামেরুনের অবতার সিনেমায় ভিন্ গ্রহ পান্ডোরায় মানুষ অভিযান চালিয়েছে। সেই গ্রহের অধিবাসীদের নিজেদের বশ্যতা স্বীকারের জন্য মানুষ যে নৃশংস অত্যাচার চালিয়েছে তার বিপরীত জ্যাক সালির নৈতিকতার লড়াই এই সিনেমার মূল বিষয়। ক্রিস্টোফার নোলানের ইন্টারস্টেলার সিনেমার নতুন গ্রহে বাসস্থানের সন্ধানে যাওয়া মহাকাশচারী বিজ্ঞানীর এই অনুভব হয়েছে যে ভালোবাসাই হল একমাত্র মাধ্যম যা গ্রহ থেকে গ্রহান্তরেও যোগাযোগ সাধনে সক্ষম। এক্স মেন সিরিজের সিনেমাগুলেতেও বড় হয়ে উঠতে দেখি মানবিক মূল্যবোধের লড়াইকেই।*

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি ঃ

১. *প্রেমেন্দ্র মিত্র। 'কল্পবিজ্ঞান সমগ্র'। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা। পঞ্চম সংস্কারণ। জুন ২০২২*

২. *সত্যজিৎ রায়। 'শঙ্কু সমগ্র'। আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা। প্রথম সংস্করণ, অষ্টাদশ মুদ্রণ। নভেম্বর ২০২১।*

৩. *সিদ্ধার্থ ঘোষ। 'প্রবন্ধ সংগ্রহ ১'। বুক ফার্ম, কলকাতা। পরিমার্জিত সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি, ২০১৭।*

সত্যজিতের সিনেমায় মনুষ্যেতর প্রাণী

সঞ্জীব মান্না

[**বিষয়-চুম্বক ঃ** *মানুষের ব্যাপ্ত জীবনের সঙ্গে সলগ্ন থাকে প্রকৃতি ও প্রাণীকুল। সাহিত্য, চিত্রকলা, ভাস্কর্য ইত্যাদিতে মানুষের জীবনের কথা বলা হয়। এগুলির তুলনায় নবীন আগন্তুক চলচ্চিত্র। সেখানেও মানুষ প্রধান। মানুষের জীবনচর্যা দেখাতে গিয়ে সেখানে এল প্রকৃতি ও মানব-সংলগ্ন মনুষ্যেতর প্রাণী। সত্যজিৎ (১৯২১-১৯৯২) চিত্রশিল্পী। পরে পেশা হিসেবে বেছে নিলেন চলচ্চিত্র পরিচালনার। সেখানে কেমনভাবে মানব-জীবনের সঙ্গে মনুষ্যেতর প্রাণীর ওতপ্রোত সম্পর্ককে দেখিয়েছেন তাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্রপঞ্জিতে আছে আটাশটি সিনেমা, পাঁচটি তথ্যচিত্র এবং তিনটি দূরদর্শন-চিত্র। একটি প্রবন্ধের পরিসরে এই সবগুলিকে ধরা সম্ভব নয়। এখানে তাঁর জনপ্রিয় সিনেমার আলোচনায় করা গেল। সেগুলি সত্যজিতের বহুমাত্রিক শিল্প ভাবনাকেই তুলে ধরবে। বিস্মিত হতে হবে পাঠককে। প্রাবন্ধিক এখানে সূত্রধর মাত্র।*

সূচক-শব্দ ঃ *সত্যজিৎ রায়, চলচ্চিত্র, সিনেমা, মনুষ্যেতর, হাথি মেরে সাথি, পথের পাঁচালী, অপরাজিত, অপুর সংসার, কাঞ্চনজঙ্ঘা, চিড়িয়াখানা, জলসাঘর, হীরক রাজার দেশে, আগন্তুক, বাইসাইকেল থিবস্*]

'মনুষ্যেতর' শব্দবন্ধের সঙ্গে মিশে আছে 'ইতর' শব্দটি। এই 'ইতর' শব্দটিকে তুলনামূলকভাবে নিম্নবর্ণের সূচক মনে করা হয়। কিন্তু প্রাচীনকালে 'ইতর' শব্দের অর্থ ছিল 'অপর'। এই অপরের সঙ্গে শ্রেণি-বিভক্ত সমাজের 'নিচু' অর্থটি জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এই নিবন্ধে 'অপর' অর্থেই গ্রহণ করা হল 'ইতর' শব্দটি। অর্থাৎ যারা মানুষ নয়; পশু পাখি, কীট, পতঙ্গ, সরীসৃপ ইত্যাদি। মানুষ আর এদের অস্তিত্ব একসময় যত নিবিড় ছিল এখন নগর জীবনের অভ্যাসে ততটা নেই। কিন্তু তা হলেও মানব-জীবনকে পূর্ণতা দেয় এই প্রাণীকুল। অবশ্য তাদের সঙ্গে বৃক্ষ, লতা, জল, মাটি, আকাশ, পর্বত - সবই আছে। কিন্তু এই নিবন্ধে পশু-পাখি-পতঙ্গ- সরীসৃপকেই আলোচনার বৃত্তে গ্রহণ করা হল।

মানুষের শিল্প সৃষ্টিতে মনুষ্যেতর প্রাণীর স্থান প্রায়শই থাকে। কখনও তা স্রষ্টার বিশেষ উদ্দেশ্যসিদ্ধির উপায় হিসেবে, কখনও তা মানুষকে ঘিরে যে বাতাবরণ প্রত্যক্ষ হয় তার অংশরূপে। সাহিত্যে মনুষ্যেতর প্রাণীর উল্লেখ পাওয়া যায়। তেমনই পাওয়া যায় ভাস্কর্যে, স্থাপত্যে এবং চিত্রকলায়। চলচ্চিত্র অপেক্ষাকৃত নবীন এক সৃষ্টিকলা, যেখানে যন্ত্রের সাহায্যে নির্মিত হয় দৃশ্য, বর্ণ, শব্দ এবং গতি। ফলে জীবন্ত প্রাণীকে পূর্ণতরভাবে চলচ্চিত্রে স্থান দেওয়া সম্ভব। সে দৃষ্টান্ত দেশে, বিদেশের চলচ্চিত্রে কম নেই। কোনও তালিকা এখানে দেব না। কিন্তু যে কোন পাঠকেরই মনে পড়বে 'অ্যানাকোন্ডা', 'কিং কং', 'কুংফু পান্ডা' এবং সম্পূর্ণ কল্পনার আশ্রয়ে তৈরি 'জুরাসিক পার্ক'-এর কথা। এসব সিনেমা মানুষের জন্য তৈরি হলেও মানুষ নয়; মনুষ্যেতর প্রাণীই প্রধান চরিত্র।

ভারতীয় চলচ্চিত্রের যে কোনও কারণেই হোক, ঠিক তেমন দৃষ্টান্ত কম। মানুষের গল্পই বলা হয় এদেশের সিনেমায়। তবে কোথাও কোথাও পশুপাখির চিত্রায়ণ প্রায় সমানই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। যেমন, একটি জনপ্রিয় বাণিজ্যিক হিন্দি চলচ্চিত্র ছিল 'হাথি মেরে সাথি'।[১]

Sanjib Manna, Assistant Professor, Centre for Distance & Online Education, Rabindra Bharati University, Kolkata

সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্র এই নিবন্ধের অবলম্বন। সত্যজিৎ রায় মনুষ্যেতর প্রাণী-প্রধান কোন চলচ্চিত্র নির্মাণ করেননি। তাঁর নির্মিত ছবিতে মানুষকেই তুলে ধরেন তিনি, কিন্তু মানুষ যে ব্যাপ্ত জীবনের অঙ্গ সেই জীবনে নিসর্গ আর প্রাণীকুল অবিচ্ছিন্ন — এই সত্যটি তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। সত্যজিৎ রায় নির্মিত সিনেমায় কীভাবে এক একটি দৃশ্যে মানুষ্যেতর প্রাণী ঢুকে পড়েছে সেটুকুই আমরা দেখতে চাই। আমরা জানি, সিনেমায় যে কোনও দৃশ্য-নির্মাণ করা হয় সচেতনভাবে। চাইলেই যে কেউ সেই দৃশ্যের অন্তর্গত হতে পারে না। সত্যজিতের মতো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রকারের সিনেমায় কেন এল এই মনুষ্যেতর প্রাণীরা তারই বিশ্লেষণ এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য।

সত্যজিতের অনেক সিনেমায় পশুপাখি আসছে সিনেমার স্থানিক পরিচয়কে সম্পূর্ণতা দেওয়ার জন্য। যেমন আমাদের মনে পড়বে, বেনারসের রাস্তায় ষাঁড়, মন্দিরের বাঁদর ('অপরাজিত')[২] রাজস্থানের উট ('সোনার কেল্লা')[৩]। স্থানিক বাস্তবতা সত্য হয়ে ওঠে এইসব পশুপাখি কীট-পতঙ্গের উপস্থিতিতে। সত্যজিৎ রায় তা বুঝতেন যথার্থই, তাই তাঁর সিনেমায় এভাবে মনুষ্যেতর আসে।

কোথাও কোথাও পশুপাখিকে এমনভাবে পরিচালক সিনেমায় ব্যবহার করেন যেখানে তারা হয়ে ওঠে মানব-মনের এবং অনুভবের ব্যঞ্জনা-বাহক। যেমন, 'অপরাজিত'[৪] সিনেমায়, অপুর বাবা হরিহর যখন মারা যাচ্ছেন তখন কাশীর গঙ্গার ঘাটের পাখিগুলি হঠাৎ ছটফটিয়ে উড়তে শুরু করে। প্রাণপাখি উড়ে যাচ্ছে হরিহরের; সর্বজয়া আর অপুর জীবনেরও শান্তি বিঘ্নিত হবে। আবার গৃহহীন হবে তারা — এই সবকিছু একসঙ্গে পায়রাগুলিকে দৃশ্যপটে এনে দেখিয়ে দিচ্ছেন পরিচালক সত্যজিৎ। লোকের বাড়িতে কাজ করতে হয় সর্বজয়াকে। আর সেই বাড়িতে অপুকে বৃদ্ধ গৃহস্বামীর মাথার পাকাচুল বেছে দিতে হয়। তার জন্য পয়সা পায় অপু। সেই পয়সায় ছোলা কিনে অপু মন্দিরের বাঁদরদের খাওয়ায়। আনন্দিত বাঁদরের দল মন্দিরের ঘন্টা বাজায়। অপু বালকমাত্র। ভৃত্যের মতোই বাড়ির মালিকের সেবা করে সে কিছু পয়সা পায়। কিন্তু সেই পয়সা তার মনকে অনুগ্রহপ্রার্থী চাকর করে দেয়নি। সেই পয়সা মায়ের হাতেও দেবার কথা তার মনে পড়ে না। দারিদ্রের জাঁতায় আবদ্ধ বালকটি সেই পয়সায় বাঁদরদের খাইয়ে যেন মুক্তির আনন্দ অনুভব করে। এই দৃশ্যটি তুলে ধরে অপুর বালক-মনকে। সর্বজয়া তার জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে বাপের বাড়ির গ্রামে চলে যায়। গাছপালার মাঝে পাখির কলতানে মুখরিত হয় দৃশ্যপট।

'কাঞ্চনজঙ্ঘা'[৫] সিনেমায় সরাল পাখি ভালবাসেন জগদীশ চট্টোপাধ্যায়। পাখির ডাক শুনে চোখে দূরবিন লাগিয়ে পাহাড়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে খুঁজে বেড়ান পাখি। একঝাঁক পাখি উড়ে যাওয়ার দৃশ্য আনন্দের, বন্ধনমুক্ত জীবনের আস্বাদ দেয়। পরিচালক সত্যজিৎ পাখির উড়ে যাওয়ার দৃশ্যকে বহুমাত্রিক বিস্তার দেন। 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' চলচ্চিত্রে ইন্দ্রনাথ চৌধুরীর গৃহিণী লাবণ্য চরিত্রটি স্বামী দাপটে অনেকটাই কুণ্ঠিত থাকে। নিজের মনকে মুক্তি দেবার অবকাশ তাঁরও জোটে না। জগদীশ চট্টোপাধ্যায় তাঁর দাদা। ভাই ও বোনের মধ্যে মনের বন্ধনের ব্যঞ্জনা চলচ্চিত্রে অনুভব করা যায়। উড়ে যাওয়া একঝাঁক পাখি এখানে যেন বদ্ধ চিত্তের মুক্তির ইশারা।

'পথের পাঁচালী'[৬] চলচ্চিত্রে অনেকদিন চিঠি না পাওয়ার পর যখন চার মাস বাদে হরিহরের চিঠি আসে সর্বজয়ার কাছে তখন সর্বজয়ার আনন্দের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায় জলের উপর ভাসমান চারপেয়ে পোকাদের ইতস্তত ঘোরাফেরা। পরিচালক ক্লোজআপ ক্যামেরায় জুম করে সেই দৃশ্যকে তুলে দিয়েছেন পাঠকের কাছে। জলের কাঁপন সর্বজায়ার হৃদকম্পনকে তুলে ধরে।

কোথাও পরিচালক সত্যজিৎ পশুপাখি আর কীট-পতঙ্গকে দৃশ্যে ধারণ করেছেন সিনেমার কিছু বক্তব্যকে তুলে ধরার জন্য। দৃষ্টান্ত হিসেবে পাঠকের মনে পড়বে, 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' সিনেমার 'ঘোড়া'কে। পাহাড়ি ঘোড়া। তার পিঠে চড়ে বারবার পাক খাচ্ছে একটি শিশুকন্যা। যতবারই ঘোরে, ঘোরা আর তার শেষ হয় না। শিশুটি মনীষার দিদির মেয়ে টুকলু। মনীষার দিদির সঙ্গে তার স্বামীর সম্পর্ক প্রায় বিচ্ছিন্ন হতে বসেছিল কারণ মনীষার দিদি বিয়ের আগে একজন অভিনেতাকে ভালবেসেছিল। বিয়ের এতদিন পরে সেই অভিনেতা চিঠি পাঠায় তার প্রাক্তন প্রেমিকাকে। মনীষার জামাইবাবু সেটি জেনে ফেলে। বাবা-মায়ের তীব্র বাগ্‌বিতর্কের মাঝে টুকলু ঘোড়ায় চড়ে সরল মনে ঘুরতে থাকে। ঘোড়ার মনের মধ্যে যেমন সংসারের জট নেই, তেমনই শিশুটির মনেও কোনও জটিলতা নেই। ঘোড়ার পিঠে টুকলু-যেন দুই সরল প্রাণের বিহার।

তারপর সব বিতর্ক শেষ হয় টুকলুর কী হবে ভেবে। ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে টুকলু চড়ে বাবার কোলে। এই সিনেমাতেই আছে, ইন্দ্রনাথ চৌধুরী তাঁর কন্যা মনীষাকে বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন একজন ইঞ্জিনিয়ার পাত্রের সঙ্গে। কিন্তু মনীষার তাকে বিশেষ ভালো লাগেনি। পাহাড়ি রাস্তায় মনীষাকে সেই ইঞ্জিনিয়ার মিস্টার ব্যানার্জি ভালোবাসার কথা শোনাতে যখন উদগ্রীব, তখন পাশ দিয়ে চলে যায় একপাল পাহাড়ি ঘোড়া। তাদের গলায় লাগানো ঘন্টার শব্দে চারিদিক মুখরিত হয়ে ওঠে। প্রার্থিত নীরবতার অভাবে মণিকে আর শোনানো হয় না ভালোবাসার কথা। কী অনবদ্য প্রয়োগ। মিস্টার ব্যানার্জি একজন খুবই ভদ্র মনের মানুষ। কিন্তু তাঁর সমস্ত ব্যক্তিত্বই নাগরিকতার আচরণে ও অভ্যাসে নিজের মনকে বাঁধতে পারে নি। পিতার নির্বাচিত সুপাত্র হয়ে যায় অকিঞ্চিৎকর। এই ব্যঞ্জনাটি ফুটে ওঠে ঐ দৃশ্যে।

'জলসাঘর'[৭] চলচ্চিত্রের জমিদারের হস্তিনীকে মনে পড়ে। জমিদার তাকে বলতেন 'ছোটগিন্নি'। জমিদারের পুত্র—জমিদার তাই তাকে মাতৃসম্বোধন করেন। মনে পড়ে জমিদারের ঘোড়া তুফানকে। অবসিতপ্রায় জমিদারি, শেষ অগ্নিশিখা জ্বলে উঠেছিল তুফানের সওয়ার জমিদারের অন্তিম শয়নের আগে। এভাবেই মনুষ্যেতর প্রাণী মানুষের অস্তিত্বের অঙ্গীভূত হয়ে যায়। 'জলসাঘর' চলচ্চিত্রে পানপাত্রের মধ্যে ঘুরন্ত পোকার দৃশ্যটিও ভোলা যায় না। জমিদারতন্ত্রের পতনের অভ্রান্ত ইঙ্গিত।

পরিচালক সত্যজিৎ রায় পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গকে মাঝে মাঝে বিশেষ ইঙ্গিত বোঝাতেও ব্যবহার করেছেন। যেমন, 'অপুর সংসার'[৮] সিনেমার কথা ভাবতে পারি। অপু কাজ খুঁজছে কিন্তু সর্বত্র 'না' শুনতে হচ্ছে। ঘরভাড়া তিন মাসে একুশ টাকা বাকি। সে যখন রেললাইন পেরিয়ে ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফেরে তখন লাইনের উপর দিয়ে শুয়োরের দল চলে যাচ্ছিল। অপূর্ব তাদের তাড়িয়ে তাড়িয়েই পাথ করে ঘরে ফেরে। অপূর্ব আর শুয়োরগুলির অবস্থা যেন একই বিন্দুতে গিয়ে মিলেছে — এই বার্তাই পরিচালক সত্যজিৎ সম্ভবত দিতে চেয়েছেন এখানে।

তার পরপরই আছে এক আশ্চর্য দৃশ্য। বন্ধু পুলুর নিমন্ত্রণে অপূর্ব নদীপথে চলে খুলনায়। নদীর ধারে অনেক বাছুর চরে বেড়াচ্ছে। পরিচালক দর্শককে দেখালেন নৌকোতে অপূর্ব হেলান দিয়ে বাঁশি বাজাচ্ছে, আর নদীর তীরে গরু-বাছুর মুখ তুলে বাঁশির শব্দ অনুসরণ করছে। যেন একটা কৃষ্ণ-ইমেজ নির্মিত হল অপূর্বকে কেন্দ্র করে। এরপরেই অর্পূবের জীবনে আসবে বিয়ে এবং প্রেম। বিয়ে করে ঘোড়ায় টানা গাড়িতে সস্ত্রীক অপূর্ব আসে সেই ভাড়াবাড়িতে। দাম্পত্য জীবনে এল সন্তান। কিন্তু খুলনার শ্বশুর-বাড়িতে সন্তান প্রসবের সময় মারা পড়ল স্ত্রী। সেই কষ্টে সন্তানের মুখ পর্যন্ত দেখল না অপূর্ব। টাকা পাঠায় কিন্তু সন্তানকে দেখে না। সে সন্তান বড়ো হয়। নাম কাজল। বয়স পাঁচ বছর। সে গাছের ডালের পাখিকে মেরে সেই মৃত পাখি দেখিয়ে লোককে ভয় দেখায়। মানুষকে কামড়ে দেয়। মরা চড়ুইকে গুলতি দিয়ে মারার পর যখন মৃত চড়ুইকে বালকটি দেখছে, জুম ক্যামেরায় পরিচালক দেখিয়েছেন সেখানে পাখিটিকে মারার নিষ্ঠুরতার পরিবর্তে বড়ো হয়ে দাঁড়িয়েছে সরল উৎসাহ। কেমন তার পাখা, পা-জোড়া ইত্যাদি অপার বিস্ময়ে দেখে সে।

পাঠকের মনে পড়বে, 'অপরাজিত' সিনেমায় সর্বজয়ার মৃত্যুদৃশ্য। অপূর্ব কলকাতার স্কুলে স্কলারশিপ পেয়ে মাকে ছেড়ে পড়তে চলে যায়। নিঃসঙ্গ সর্বজয়া ছেলের ফেরার পথ চেয়ে বসে থাকে। সেই নিঃসঙ্গ জীবনে একটি কুকুরকে দাওয়ার সামনে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। মৃত্যুর আগে সর্বজয়া অন্ধকারে হঠাৎ অপুর ডাক শুনতে পায়। পর্দায় দেখা যায় জলের উপর অনেকগুলি ঝিঁঝিঁপোকা ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারপর আর মৃত্যু আলাদা করে দেখানো হয় না। বোঝাই যায়, এই ঝিঁঝিঁ পোকার ডাকের দৃশ্যের মাধ্যমেই মৃত্যুর ইঙ্গিত দিয়ে দেন পরিচালক সত্যজিৎ।

কোথাও কোথাও সত্যজিৎ চলচ্চিত্রে সরাসরি প্রতীক ব্যবহার করেছেন। প্রতীক হল কোনও একটি বস্তু বা দৃশ্য, যার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে পরম্পরা-আশ্রিত চিন্তন ও অনুভূতি। সেখানে ব্যাখার প্রয়োজন হয় না। প্রতীকটির তুলে ধরলেই শিল্পের উপভোক্তা সেই অনুভূতিকে মনে মনে স্পর্শ করতে পারেন। যেমন, এর আগে দেখানো হয়েছে উড়ন্ত পাখি মুক্তির প্রতীক। 'সোনার কেল্লা' সিনেমায় ব্যবহৃত ময়ূর সৎ-সুন্দর ও ভালোর প্রতীক। ভালো ও সৎ মানুষেরা ময়ূরকে দেখে আনন্দিত হয় আর জটিল, দুষ্ট অপরাধীরা ভয় পায় ময়ূরকে দেখে। এটিও প্রতীক অর্থে ব্যবহৃত।

আমাদের মনে পড়বে 'চিড়িয়াখানা'[৯] চলচ্চিত্রটি। শুরুতেই ব্যোমকেশ একটি সাপ নিয়ে বলে, 'বিচিত্র জীব এই সাপ,

মেরুদন্ডহীন এই অপবাদটি আর যাকেই দাও, সাপকে দেওয়া চলে না।' এর পরেই আসে গল্পের সমস্যা। ক্লায়েন্ট নিশানাথবাবু। পরে তাকেই হত্যার অনুসন্ধান করতে নামেন ব্যোমকেশ। সেই সমস্যার সমাধানে একজন বোবার সঙ্গে দেখা করেন সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ। তার পর পানুগোপাল। তার হাতে একটি সারমেয়-শাবক। সারমেয়টি যেমন কোনও কথার উত্তর দিতে পারে না, মানুষটিও তেমনই। এখানেই সত্যজিৎ দর্শকদের মনে নিজের স্বাতন্ত্র্য স্থাপন করেন। একটি অবোলা গরুর চোখের দিকে ক্যামেরা ক্লোজআপ করে পানুগোপালকে খুনে দৃশ্য রচনা করেছেন পরিচালক। এই দৃশ্যটিকে বাক্যহীনতা যেভাবে ব্যঞ্জিত হয়েছে তা দর্শককে বিস্মিত করে দেয়। পানুগোপাল কথা বলতে পারে না। তার সঙ্গী কুকুরছানাও কথা বলতে পারে না। পানুগোপালের খুন হওয়ার দৃশ্যটি গরুর চোখ দিয়ে দেখানো হয়। গরুও কথা বলতে পারে না। এই পুঞ্জীভূত ভাষাহীনতার মধ্যে দিয়ে উঠে আসে সত্য। এই সত্য উদ্ভাসিত হয় মনুষ্যেতর প্রাণীর চোখে। সেই দৃশ্যটিকে নিজের মনে গড়ে নিতে পারে না বলেই গোয়েন্দা এখানে সত্যান্বেষী।

সিনেমার শেষ দৃশ্যে প্রথম দৃশ্যের সাপ চিত্রকল্পটির অর্থ পরিস্ফুট হয়। হত্যাকারীর নাম ভুজঙ্গধর। সিনেমার শুরুতে ব্যোমকেশ একটি সাপকে নিয়ে নাড়াচাড়া করেছিল। চলচ্চিত্রের শেষে প্রতিষ্ঠিত হয় সাপের মতো অপরাধীর চরিত্রকে উদঘাটন করবার কৃতিত্ব। চলচ্চিত্র-সমালোচক হিরন্ময় মুখোপাধ্যায়ের সত্যজিৎ রায়ের 'চিড়িয়াখানা' সম্পর্কে বলেছেন, ''প্রতীকী অর্থে সাপকে ব্যবহার করা যেতে পারে অপরাধীর কুটিল মানসিকতা বোঝাবার জন্য। এখানে তেমন উদ্দেশ্য থাকতেই পারে। কিন্তু সাপকে দেখানোর আসল মজাটা আছে শব্দের খেলায়। সুকুমার রায়ের পুত্র শব্দের মজার এই দিকটা বারবার তাঁর চলচ্চিত্রে ব্যবহার করেছেন। শরদিন্দুর উপন্যাসে অপরাধী ডাক্তারের নাম ভুজঙ্গধর। সেখান থেকেই সত্যজিৎ রায়ের মনে সাপ দেখাবার পরিকল্পনাটি আসে। এখানেই তিনি রেখে গেছেন দর্শকদের জন্য আগাম ইঙ্গিত। যখনই গোলাপ কলোনির বাসিন্দাদের পরিচয় দেবার সময় ডাক্তারের নাম বলা হয় ভুজঙ্গধর; তখনই দর্শকের মনে চকিতে উদ্ভাসিত হতে পারে সাপ হাতে ধরা উত্তরকুমার অর্থাৎ গোয়েন্দা ব্যোমকেশের ছবি। প্রকৃত অর্থে ভুজঙ্গধর ও ব্যোমকেশ শিবেরই দুই নাম, যদিও অর্থ ভিন্ন। অপরাধী ও গোয়েন্দার এই নামসাম্য হয়তো অর্থের ভিত্তিতেই করেছিলেন লেখক। ভুজঙ্গ যাঁর কাছে নত তিনিই ভুজঙ্গধর। তাকে বুদ্ধির খেলার পরাস্ত করেন ব্যোমকেশ যে নামে ব্যাঞ্জনা আর মহৎ। এই দিকটির ইঙ্গিত যেন এখানে পাই।''[১০]

সাপ ব্যবহৃত হয়েছে 'পথের পাঁচালী' সিনেমার শেষ দৃশ্যেও। এখানে কিন্তু সাপের প্রতীক-ব্যঞ্জনা আলাদা। হরিহর গ্রামের বাড়িতে ফিরে এসে সিদ্ধান্ত নেয়, গ্রাম ছেড়ে সে সপরিবারে কাশী চলে যাবে চিরকালের জন্য। পাড়া প্রতিবেশীরা এসে দেখা করে যায়। তবু হরিহর সিদ্ধান্তে অটল। ভিটে বাড়ি ছেড়ে যাচ্ছে হরিহরের পরিবার। পরিচালক শেষদৃশ্যে দেখান একটি সাপ সেই পোড়ো বাড়িতে ধীরে ধীরে প্রবেশ করছে। এই সাপের উল্লেখ বিভূতিভূষণের (১৮৯৪-১৯৫০) উপন্যাসে ছিল না। গ্রামের মানুষের অভিজ্ঞতায় এমন প্রায়ই দেখা যায় যে, ভাঙা, পোড়ো বাড়িতে যেখানে মানুষ থাকে না, সেখানে বাস করে সাপ। সেই ইঙ্গিতই পরিচালক সত্যজিৎ রায় এই দৃশ্যে ব্যক্ত করেছেন।

সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্রে আরও বহু ক্ষেত্রে মনুষ্যেতর প্রাণীর উল্লেখ আছে। কোথাও তার ইঙ্গিত কৌতুকময়। যেমন দেখা যায়, 'পথের পাঁচালী'-র একটি দৃশ্যে বাঁক কাঁধে মিষ্টি-বিক্রেতার পিছন পিছন চলেছে দুর্গা আর অপু; তাদের পিছনেই একটি কুকুর; কুকুরের সঙ্গে যোগ দেয় কয়েকটি হাঁস। এই কৌতুকময় দৃশ্যটি প্রতিফলিত হয়েছে পুকুরের জলে। এই ছোটো মিছিলের পদক্ষেপে যে বাদ্যযন্ত্র বাজে সেখানেই আছে একটি কৌতুকের ভাব।

আর একটি কৌতুকময় দৃশ্য হল 'আগন্তুক'[১১] সিনেমায় কানে কম শোনেন এমন একজন উকিলের সামনে চিৎকার করে কথা বলছেন সুধীন্দ্র বোস (অভিনয়ে দীপঙ্কর দে)। বাক্যের আংশিক শুনতে পাচ্ছেন সেই উকিল কিন্তু তিনি কোলে বসে থাকা একটি বিদেশি লোমশ কুকুরের গায়ে হাত বুলিয়ে চলেছেন। প্রায় - বধির মানুষটির কাছে বাক্যমুখর জিজ্ঞাসুর চেয়ে ভাষাহীন কুকুরটি অনেক বেশি কাছের।

কোথাও কোথাও রং-এর প্রয়োগেও চমক লাগে। যখন দেখি, 'অশনি সংকেত'[১২] চলচ্চিত্রের দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মৃত্যু-পথযাত্রীর পাশেই বহুবর্ণময় প্রজাপতি, টকটকে লাল ফড়িং। এই রং প্রকৃতির। মানুষের তৈরি দুর্ভিক্ষ ছিল

তেতাল্লিশের মন্বন্তর। প্রকৃতির রং সেই দুর্ভিক্ষে বিবর্ণ হয় না।

আরও বহু সিনেমা দৃশ্যে বিভিন্নভাবে মনুষ্যেতর প্রাণীর চলচ্চিত্রায়ণ আছে। তার সবগুলি উল্লেখ করতে গেলে প্রবন্ধটি গ্রন্থরূপ ধারণ করতে পারে। আর দুটিমাত্র দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা গেল। একটি হল, 'হীরক রাজার দেশে'[১৩] চলচ্চিত্রের রাজার তোষাখানায় প্রহরারত বাঘ। গুপীর গান শুনলে প্রাণীকুল চলচ্ছক্তিরহিত হয়ে যায়। বাঘকে শান্ত রাখার জন্য গুপীর সেই গান - 'পায়ে পড়ি বাঘ মামা / কোরো নাকো রাগ মামা' কোনও দর্শক শ্রোতা কখনও ভুলতে পারবে না। ভয়, সাসপেন্স এবং কৌতুকের এত নিপুণ সংমিশ্রণ ঐ বাঘ না থাকলে সৃষ্টি করা সম্ভব ছিল না।

সবশেষে বলব 'আগন্তুক' চলচ্চিত্রের বাইসনের ছবির কথা। এই বাইসন স্বরূপে আসেনি। প্রাচীন কালের আরণ্যক মানুষেরা গুহার গায়ে এঁকে রেখেছিল এক আক্রমণে উদ্যত বাইসনের ছবি। নৃতাত্ত্বিক ইতিহাসের সংস্কৃতিতে এই বাইসন একটি প্রতীকরূপে প্রতিষ্ঠিত। জীবনের তীব্র প্রাণশক্তি। যে শক্তি ভয় পায় না, পলায়ন করে না, লুকিয়ে বসে থাকে না। প্রবল বিক্রমে বাধা অতিক্রম করে ছুটে যেতে চায়। স্পেনের উত্তরে অবস্থিত আলতামিরা গুহার প্রাচীন বাইসনের ছবিটিকেই ব্যবহার করেছেন সত্যজিৎ রায়। এই বাইসনকে রেখেছেন হিসেবি, সাবধানী, স্বার্থকেন্দ্রিক সীমাবদ্ধ নাগরিকতার পালিশ দেওয়া জীবন-যাপনের বিপরীতে। এভাবেই সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্রে বিভিন্নভাবে জীবনের বহুমুখিনতা দৃশ্যময় হয়ে ওঠে।

চাকরিসূত্রে সত্যজিৎ সপরিবারে গিয়েছিলেন ইংল্যান্ড-এ। কাজের পাশাপাশি তিনি অসংখ্য চলচ্চিত্র দেখেছিলেন। সেই সময় তিনি সেখানে দেখেছিলেন ভিওরিও ডি সিকা (১৯০১-১৯৭৪)-র ছবি 'বাইসাইকেল থিবস' (ইটালিয়ান ভাষায় মুক্তি - ২৪ ডিসেম্বর ১৯৮৪)। একেবারে রাস্তার মধ্যে ঘরের মধ্যে ক্যামেরা নিয়ে শুটিং নির্ভর এই সিনেমা সত্যজিৎ রায়ের চিন্তায় গভীরভাবে প্রভাব ফেলেছিল। এই সময় বিশ্ব-সিনেমায় চলছিল 'নিও-রিয়ালিস্টিক' সিনেমার সময়কাল। বাইরের চাকচিক্য আর বাঁধা সেট ছেড়ে সিনেমা পৌঁছে গিয়েছিল মানুষের চেনা রাস্তার উপরে। ফলে মানুষ নিজের চেনা বাস্তবকেই দেখছিল সিনেমার পর্দায়। ফলে একাত্ম হচ্ছিল দর্শক আর অভিনয়। সত্যজিৎ সেই সিনেমার ধারাকে বহন করে আনলেন নিজের দেশে। বাংলা সিনেমা দেখল 'পথের পাঁচালী'। বিশ্বসেরা অস্কার পেলেন পরিচালক সত্যজিৎ রায়। 'বাইসাইকেল থিবস্' যাঁরা দেখেছেন তাঁরা জানেন, একটি দৃশ্যে ছিল প্রভুর কোলে একটি কুকুর। একথা উল্লেখ একারণেই করছি— চলচ্চিত্রে মনুষ্যেতর প্রাণীকে অন্তর্গত করে নেওয়া সিনেমার একটি প্রয়োগ-কৌশল। সত্যজিৎ রায় প্রথম থেকেই সেই বিষয়ে সচেতন ছিলেন। তাঁর চলচ্চিত্রের দর্শক তাঁর নির্মিত সিনেমা থেকে প্রকৃতি, পশুপাখি ও সৌরজগৎ সহ এক বিস্তীর্ণ প্রেক্ষাপটে মানুষকে অনুভব করতে পারেন।

সূত্র-সংকেত ও টীকা ঃ

১. *হাথি মেরে সাথি (হিন্দি সিনেমা) - মুক্তি ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দ। পরিচালক - এম. এ. থিরুমুগাম। চিত্রনাট্য লিখেছিলেন সেলিম ও জাভেদ। সংলাপ লিখেছিলেন ইন্দর রাজ আনন্দ। প্রযোজক - দেবর ফিল্মমস্।*

২. *অপরাজিত (বাংলা সিনেমা) - মুক্তি - ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দ। চিত্রনাট্য ও পরিচালনা - সত্যজিৎ রায়, কাহিনি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রযোজনা করে এপিক ফিল্মস।*

৩. *সোনার কেল্লা (বাংলা সিনেমা) - মুক্তি - ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দ। চিত্রনাট্য রচনা, সংগীত পরিচালনা এবং সামগ্রিক পরিচালনা করেন সত্যজিৎ রায়। কাহিনিকার সত্যজিৎ রায়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থানুকূল্যে নির্মিত হয় সিনেমাটি।*

৪. *অপরাজিত (বাংলা সিনেমা) - মুক্তি - ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দ। চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনা করেন সত্যজিৎ রায়। কাহিনি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। প্রযোজনা করে এপিক ফিল্মস।*

৫. *কাঞ্চনজঙ্ঘা (বাংলা সিনেমা) - মুক্তি - ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দ। চিত্রনাট্য রচনা, সংগীত পরিচালনা এবং সামগ্রিক পরিচালনা করেন সত্যজিৎ রায়।*

৬. *পথের পাঁচালী (বাংলা সিনেমা) - মুক্তি - ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দ। চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনা করেন সত্যজিৎ রায়। প্রযোজনা করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার।*

৭. *জলসাঘর (বাংলা সিনেমা) - মুক্তি - ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দ। চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনা করেন সত্যজিৎ রায়। কাহিনি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রযোজক সত্যজিৎ রায় প্রোডাকশন।*

৮. *অপুর সংসার (বাংলা সিনেমা) - মুক্তি - ১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দ। চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনা করেন সত্যজিৎ রায়। কাহিনি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। প্রযোজনা সত্যজিৎ রায় প্রোডাকশন।*

৯. *চিড়িয়াখানা (বাংলা সিনেমা) - মুক্তি - ১৮৬৭ খ্রিষ্টাব্দ। চিত্রনাট্য রচনা, সংগীত পরিচালনা এবং সামগ্রিক পরিচালনা করেন সত্যজিৎ রায়। কাহিনি শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রযোজক স্টার প্রোডাকশন।*

১০. *হিরন্ময় মুখোপাধ্যায়, সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্রে বাংলা সাহিত্য, ইন্টারন্যাশানাল ইনটিটিউট অব পারফরমিং আর্ট, কলকাতা, ২০১১, পৃষ্ঠা ৩৫৬-৩৫৭।*

১১. *আগন্তুক (বাংলা সিনেমা) - মুক্তি ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দ। চিত্রনাট্য রচনা, সংগীত পরিচালনা এবং সামগ্রিক পরিচালনা করেন সত্যজিৎ রায়। কাহিনি - সত্যজিৎ রায়। প্রযোজক এন.এফ.ডি.সি.*

১২. *অশনি সংকেত (বাংলা সিনেমা) - মুকিত ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দ। চিত্রনাট্য রচনা, সংগীত পরিচালনা এবং সামগ্রিক পরিচালনা করেন সত্যজিৎ রায়। কাহিনি - বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রযোজক বলাকা মুভিজ।*

১৩. *হীরক রাজার দেশে (বাংলা সিনেমা) - মুক্তি ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দ। চিত্রনাট্য রচনা, সংগীত পরিচালনা এবং সামগ্রিক পরিচালনা করেন সত্যজিৎ রায়। কাহিনি - সত্যজিৎ রায়। প্রযোজক পশ্চিমবঙ্গ সরকার।*

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জিঃ

১. *পার্থ বসু, সত্যজিৎ রায়, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৬।*

২. *শুভেন্দু দাসমুন্সী এবং দীপান্বিতা রায়, ছোটোদের ছবির পথের পাঁচালী, শিশুকিশোর আকাদেমি, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২০।*

৩. *সুনীত সেনগুপ্ত, সত্যজিতের ছবি ও খেরোর খাতা, গাঙচিল, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১০।*

Section II

সংগীতবিদ্যায় গানের গুণ ও দোষ

ড. সৈকত দাস

[বিষয়-চুম্বক ঃ *কাব্যতত্ত্বের মাধুর্যাদি গুণের মতোই সংগীতশাস্ত্রে গানের গুণ ও দোষের কথা প্রতিপাদন করা হয়েছে। এর প্রারম্ভ নারদের নারদীয়শিক্ষা - এটি অনুমেয়। শুধু খ্রীষ্টপূর্বযুগ নয়, তার পরবর্তীকালের সংগীতশাস্ত্রকারেরাও গানের গুণ ও দোষ প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে নারদীয় শিক্ষা, ভরতের নাট্যশাস্ত্র, মাতঙ্গ মুনির বৃহদ্দেশী ও শার্ঙ্গদেবের সংগীতরত্নকার গ্রন্থে উল্লিখিত গানের গুণ ও দোষের কথা আলোচিত হয়েছে। বিশেষভাবে অনালোচিত জৈনাগম স্থানাঙ্গসূত্র গ্রন্থের আলোচনাও প্রতিস্থাপিত হয়েছে - যা অভিনবত্বের দাবি রাখে। পাঁচটি গ্রন্থেই যে গুণ ও দোষের কথা উপলভ্য এমনটা নয়। চারটি গ্রন্থে উভয়দিকের কথা থাকলেও বৃহদ্দেশীতে কেবল দোষপ্রসঙ্গ পরিলক্ষিত। যাইহোক, শ্রোতার কাছে তখনই সেই গান সুমধুর ও শ্রবণযোগ্য হবে, যখন দোষ বর্জন করে গান গুণের দ্বারা গুণান্বিত হয়। গুণযুক্ত গানই পরিপূর্ণ রসের ও আবেশের সঞ্চার ঘটায়।*

সূচক-শব্দ ঃ *গানের গুণ ও দোষ, নারদীয়শিক্ষা, স্থানাঙ্গসূত্র, নাট্যশাস্ত্র, বৃহদ্দেশী, সংগীতরত্নাকর***]**

সাহিত্য রজোগুণ, তমোগুণাদি ব্যতীত কবির কল্পনাশক্তি ও রচনাশক্তির গুণ এবং কাব্যতত্ত্বের মাধুর্যাদি গুণ দ্বারা অনিন্দ্যময় হয়ে ওঠে অর্থাৎ গুণের দ্বারা গুণান্বিত হয়। কাব্যের শোভাবর্ধনকারী গুণের মতোই সংগীতশাস্ত্রকার কর্তৃক গীতেরও গুণ-দোষ অঙ্গীকৃত হয়েছে। নাট্যশাস্ত্রকার ভরত, গানকে নাটকের বিশ্রামস্থান হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। গান সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হলে নাট্যনুষ্ঠান কোনও বিপদের সম্মুখীন হয় না। এক্ষেত্রে গুণের দ্বারা সেই গানকে পরিশীলিত হবে হবেই।

সামবেদীয় শিক্ষাগ্রন্থ নারদীয়শিক্ষা, জৈনাগম স্থানাঙ্গসূত্র, ভরতের নাট্যশাস্ত্র, মতঙ্গের বৃহদ্দেশী, শার্ঙ্গদেবের সংগীতরত্নাকর - পাঁচটি গ্রন্থের বিষয়ই (গুণ ও দোষ) এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। নারদীয়শিক্ষার সঙ্গে গ্রন্থান্তরের আলোচনায় প্রবন্ধটি সীমাবদ্ধ। নারদীয় শিক্ষার বিষয়বস্তু বহু চর্চিত হওয়ায় পৃথকভাবে ব্যাখ্যা দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক। প্রসঙ্গানুযায়ী নারদীয়শিক্ষার ব্যাখ্যা করেই বিভিন্ন বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে।

গুণ

গুণ ব্যতীত গুণী হওয়া সম্ভব নয়। তাই গানের গুণ ও দোষ বিষয়ে শাস্ত্রকারেরা নানা অভিমত ব্যক্ত করেছেন। নারদীয় শিক্ষায় নারদ গানের দশবিধ গুণের কথা বলেছেন।[১] স্থানাঙ্গসূত্রে গীতের আট প্রকার গুণের কথা বলা হয়েছে। আগমে বলা হয়েছে —

পুন্নং রক্তং চ অলংকিয়ং চ বত্তং তহা অবিঘুষ্টং।
মধুরং সমং সুললিয়ং, অট্ঠ গুণা হোংতি গেয়স্স।।[২]

অর্থাৎ পূর্ণ, রক্ত, অলংকৃত, ব্যক্ত, অবিঘুষ্ঠ, মধুর, সম, সুললিত — এই আটটি গেয় পদের গুণ। **পূর্ণ -** আরোহ এবং

Dr. Saikat Das, Research Assistant, Dept. of Musicology, Rabindra Bharati University, Kolkata

অবরোহের সবরকম উপকরণের মাধ্যমে পরিপূর্ণ গান হল পূর্ণ (complete)। **রক্ত** - রাগের নিয়মাবলী দ্বারা রঞ্জিত ও পরিষ্কৃত গানকে রক্ত বলা হয় (delightful)। **অলংকৃত** - সুশোভিত ও সুমনোহর গান-ই অলংকৃত গান (embellished)। **ব্যক্ত** - ব্যাকরণাদি জ্ঞান সম্পন্ন স্পষ্ট উচ্চারণ যুক্ত গান ব্যক্ত (clear)। **অবিঘুষ্ট** - নিয়মিতভাবে স্বর যুক্ত গান অবিঘুষ্ট নামে অভিহিত (properly arranged notes)। **মধুর** - মধুর কণ্ঠের দ্বারা সুবিনীত গায়ক কৃত গান হল মধুর(sweet)। **সম** - যে গান তাল, বীণা ইত্যাদিকে সুষমভাবে অনুসরণ করে গাওয়া হয়, তাকে সম বলে (even)। **সুকুমার** - ললিত ও কোমল লয়যুক্ত গান সুকুমার (delight)।

এই লৌকিক গুণগুলি ছাড়াও আরো আটটি গুণের কথা বলা হয়েছে।[৩] যেমন - উরোবিশুদ্ধ, কণ্ঠবিশুদ্ধ, শিরোবিশুদ্ধ, মৃদু, রিভিত, পদবদ্ধ, সমতাল পাদোৎক্ষেপ ও সপ্তস্বরসীভর। বাঙ্ময় জগতে উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত - এই তিনটি স্থানস্বর বিদ্যমান। স্থানাঙ্গসূত্রে যে উরোবিশুদ্ধ গুণের কথা বলা হল, আসলে উদাত্তাদি তিন স্থানস্বর থেকেই উৎপন্ন হওয়ার কারণেই এই তিন গুণের উৎপত্তি। প্রকৃতপক্ষে এই তিনটি স্থানে (উদাত্তাদি) স্পষ্ট উচ্চারিত গান হল উরস্-কণ্ঠ-শিরস্ বিশুদ্ধ গান।

'**রিভিত**' গুণ বলতে আমরা সেই গান বুঝি, যে গান সূক্ষ্মরূপে ও পরিনিষ্ঠিতরূপে শ্রোতৃচিত্তকে রঞ্জিত করে। 'সপ্তসীভর' অর্থাৎ তন্ত্রাদি বাদ্যযন্ত্রের দ্বারা গীত গান।

গেয়পদের আটটি গুণ বলেছেন। কারণ, সর্বমোট যে ষোলটি (১৬) গুণ বলেছেন, তার মধ্যে অন্যতম একটি গুণল হল পদবদ্ধ। যে গান গেয়পদের দ্বারা নিবদ্ধ হয়, তাই হল পদবদ্ধ গান। গেয়পদের আটটি গুণ হল '**নির্দোষ**' অর্থাৎ দোষরহিত হতে হবে। '**সারবন্ত**' অর্থাৎ অর্থপূর্ণ হতে হবে। '**হেতুযুক্ত**' অর্থাৎ গেয়পদগুলি উদ্দেশ্যযুক্ত হবে। '**অলংকৃত**' অর্থাৎ কাব্যগুণের দ্বারা শোভা যুক্ত হবে। '**উপনীত**' অর্থাৎ আকস্মিকভাবে সমাপ্তি ঘটবে না। '**সোপচার**' অর্থাৎ কোমল ও অবিরুদ্ধ তথা অলজ্জনীয় অর্থের প্রতিপাদন করবে। '**মিত**' অর্থাৎ অল্প পদ ও অক্ষর যুক্ত হবে। '**মধুর**' অর্থাৎ শব্দ ও অর্থের প্রতিপাদন অপেক্ষা প্রিয় হবে।[৪]

নারদীয় শিক্ষার সঙ্গে স্থানাঙ্গসূত্রের মৌলিক আটট গুণের নামের সাদৃশ্য থাকলেও ব্যাখ্যার প্রকাশভঙ্গী পৃথকভাবেই প্রতিপাদিত হয়েছে। '**রক্ত**' গুণ রঞ্জকতা সৃষ্টি করবে এটি স্থানাঙ্গসূত্রের বক্তব্য। কিন্তু নারদীয় শিক্ষায় বলা হয়েছে বেণু, বীণা এবং স্বর এগুলি সুসমন্বয় ঘটলে রক্ত গুণের সৃষ্টি হয়। রক্ত গুণের যে সংজ্ঞা নারদ দিয়েছেন, তা স্থানাঙ্গসূত্রের **রক্ত** ও **সম** এই উভয় গুণের সমাহার বলে মনে হয়। অপরদিকে পূর্ণ, অলংকৃত, ব্যক্ত ও অবিঘুষ্ট - এগুলির সঙ্গে নারদীয় শিক্ষার গুণের সাদৃশ্য পাওয়া যাচ্ছে। এমনকি, স্থানঙ্গসূত্রের **সুকুমার** গুণটি নারদীয় শিক্ষার **শ্লক্ষ্ণ** গুণের সমপর্যায়ভুক্ত হয়ে পড়েছে।

নারদীয় শিক্ষায় স্বরকর্ষণের কথা উল্লিখিত হয়েছে ।[৫] স্বরকর্ষণের সময় ছয়টি দোষ পরিহার করতে হবে এমনটাই শিক্ষাকার নারদের অভিমত। ছয়টি দোষের মধ্যে একটি হল - 'অস্থিতান্ত'। যার অর্থ নির্দিষ্ট স্বরে পৌঁছানোর পূর্বেই আকস্মিক সমাপ্তি। এই অস্থিতান্ত-এর সঙ্গে স্থানাঙ্গসূত্রের গেয়পদের আটটি গুণের মধ্যে 'উপনীত' গুণের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। তবে, খ্রীষ্টপূর্বযুগের এই দুই গ্রন্থের আলোচনা অনেক বেশী প্রাঞ্জল ও তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়।

নাট্যশাস্ত্রকার ভরত, সর্বপ্রথম গানে যত্নবান হতে বলেছেন। কারণ, গানকে নাট্যের বিশ্রাম স্থান বলা হয়েছে, কণ্ঠ-যন্ত্রসংগীত সুসম্পাদিত হলে নাট্যানুষ্ঠান কোনও বিপদের সম্মুখীন হয় না।[৬] তাই গানেরর প্রশংসা করতেও তিনি ক্ষান্ত হন নি। তিনি গানের গুণ — এমনটা কোথাও বলেন নি। কেবল উৎকৃষ্ট গানের সংজ্ঞা দিয়েছেন, যেখানে গানের বৈশিষ্ট্যগুলি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। ভরতের মতে —

> পূর্ণস্বরং বাদ্যবিচিত্রবর্ণং
> ত্রিস্থানশোভং ত্রিয়তং ত্রিমাত্রম্।
> ব্যক্তং পূর্ণং প্রসন্নং চ সুকুমারমলংকৃতম্।
> সমং সুরক্তং শ্লক্ষং চ বিকৃষ্টং মধুরং তথা।।[৭]

অর্থাৎ গান হবে সম্পূর্ণ স্বরযুক্ত, বর্ণযুক্ত, যন্ত্রদ্বারা অলংকৃত। তিনটি স্থানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হবে, তিন যতি ও তিন মাত্রা

থাকবে, আনন্দ প্রদান করবে, সম ও কোমল এবং অলংকার মাধুর্যযুক্ত থাকবে। সর্বোপরি অনায়াসে সম্পাদিত হবে।

নারদীয় শিক্ষার সঙ্গে কেবলমাত্র যতি ও মাত্রার বিষয়ে ভিন্নতা প্রদর্শিত হচ্ছে। এখানে পৃথকভাবে '**ব্যক্ত**' গুণের কথা না বললেও স্বর, বর্ণ, মাত্রা ইত্যাদির কথা বলেছেন, যেগুলি নারদ প্রদত্ত '**ব্যক্ত**' গুণের মধ্যেই আলোচিত হয়েছে।[৮] নাট্যশাস্ত্রে কণ্ঠস্বরের গুণাবলীর কথা বলা হয়েছে, যা সাধারণত অন্য কোনো শাস্ত্রে উপলব্ধ নয়। নাট্যশাস্ত্রে কণ্ঠস্বরের গুণ সম্পর্কে বলা হয়েছে —

শ্রাবকোঽ থ ঘনঃ স্নিগ্ধো মধুরস্ত্ববধানবান।
ত্রিস্থানশোভীত্যেবং চ ষট্ কণ্ঠস্য গুণাঃ স্মৃতাঃ।।[৯]

অর্থাৎ উচ্চ, ঘন, স্নিগ্ধ, মধুর, সযত্ন, তিন স্থানের (উরস্, কণ্ঠ ও শিরস্) সঙ্গে স্পষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট হবে স্বর। এগুলিই ছয়টি স্বরের গুণ। যা দূর থেকে শোনা যায়, তা **শ্রাবক বা উচ্চ**।[১০] দূর থেকে যা শোনা যায়, তা উচ্চস্বরে পরিণত হওয়াটা স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু, সেই উচ্চস্বর সুমিষ্ট হলে এবং বিক্ষিপ্ত না হলে ঘন গুণে পরিণত হয়।[১১] যে স্বর উচ্চ অথচ কর্কশ নয়, তা **স্নিগ্ধ**।[১২] স্থানের উচ্চতম পর্যায়ে যদি কোনো স্বরের ব্যাঘাত না ঘটে, তখন তাকে মধুর বলে।[১৩]

যে কণ্ঠস্বরে অপ্রাচুর্য বা আতিশয্য থাকে না, তাকে বলা হয় **অবধানবান্**।[১৪] যে স্বর বক্ষ, মস্ত ও কণ্ঠ, এই তিন স্থানেই মধুর হয় অর্থাৎ যে স্বর সব সময় তিন স্থান থেকে উদ্ভূত হয়ে মাধুর্য দান করে, তাকে বলা হয় **ত্রিস্থানশোভী**।[১৫] উপরিউক্ত ছয়টি গুণ যে নামেই থাকুক না কেন, স্বরকে মাধুর্যপূর্ণ হতেই হবে এটিই ভরতের অভিমত।

সংগীতরত্নাকরে শার্ঙ্গদেব বলেছেন --

ব্যক্তং পূর্ণং প্রসন্নং চ সুকুমারমলংকৃতম্।
সমং সুরক্তং শ্লক্ষ্ণং চ বিকৃষ্টং মধুরং তথা।।[১৬]

এখানেও দশটি গুণের কথা বলা হয়েছে। সুর, ছন্দঃ রাগ, পদ, পদার্থ ও প্রকৃতি-প্রত্যয়ের স্ফুট উচ্চারণ যুক্ত গান হল '**ব্যক্ত**'।[১৭] এই ব্যক্ত গুণে যা কিছু বলা হয়েছে সবই এককথায় ব্যাকরণের অন্তর্গত বিষয়। এ থেকে বোঝা যায়, সংগীতশাস্ত্রে তথা সংগীতবিদ্যাতে ব্যাকরণের প্রয়োজনীয়তা আবশ্যক।

'**পূর্ণ**' বলতে পূর্ণাঙ্গ গমকবিশিষ্ট গানকে বোঝায়।[১৮] গমক শব্দটি ব্যাপক অর্থেই প্রচলিত। বহুপ্রকার অলংকারই গমকের পর্যায়ভুক্ত। তবে বর্তমানে একটি বিশিষ্ট অলংকারের অর্থে গমক ব্যবহৃত হয়। যেমন সারে রেগা মাপা ইত্যাদি। এখানে সা উচ্চারিত হওয়ার পর মীড়ের দ্বারা রে স্পর্শ করতে হবে। তবে মনে রাখতে হবে, গমকে মুখ্য স্বরের উপর স্থায়িত্ব থাকে, স্পর্শস্বরের নয়। আরো কয়েকটি উদাহরণ হল সাসাসা, রেরেরে ইত্যাদি। আবার সাসাসাসা, রেরেরেরে ইত্যাদি। আবার সাসাসা, গাগাগা, পাপা, রেরে ইত্যাদি। তবে এগুলি দ্রুতমাত্রায় কম্পিত হয়। অর্থাৎ একমাত্রায় চারটি (সাসাসাসা) বা তিনটি (সাসাসা) যেমন যেমন আছে, সেটি উচ্চারণ করতে হবে।

অর্থ প্রকট ও সহজবোধ্য গান হল '**প্রসন্ন**' গুণ।[১৯] অর্থ যদি পরিষ্কার না হয় এবং হৃদয় যদি সহজভাবে না গ্রহণ করে, তবে মনে সন্তুষ্টির অভাব ঘটে। তখন আর প্রসন্ন গুণের সৃষ্টি হয় না।

কণ্ঠোদ্ভূত স্বরযুক্ত গানকে '**সুকুমার**'[২০] বলে অভিহিত করা হয়েছে। এখানে স্বর বলতে সপ্তস্বর-কেই বুঝতে হবে।

মন্দ্র, মধ্য ও তার এই তিন স্থানে উচ্চারিত গানই '**অলংকৃত**'।[২১]

'**সম**' বলতে লয় ও মাত্রা যুক্ত গানকেই বোঝায়।[২২] এই সম গুণ যাঁরা স্বীকার করেছেন প্রত্যেকেরই অভিমত 'সম' অর্থ সমপর্যায়ভুক্ত। সম গুণ তাল ও মাত্রার সাথেই যুক্ত। আর, এই কারণেই আমরা গানের প্রারম্ভে যখন তাল শুরু করি, তখন তাকে 'সম' বলে থাকি। এখান থেকেই হয়ত বা 'সম' নামের কথার উৎপত্তি।

'**সুরক্ত**'[২৩] গুণের উৎপত্তি তখনই হবে, যখন মানবমনে প্রীতি উৎপাদন করবে। সেই প্রীতি বা আকর্ষণ হবে শোভনযুক্ত।

নীচ ও উচ্চ, দ্রুত ও মধ্যাদি লয়ে যখন কোনো বৈসাদৃশ্য থাকবে না, তখন *'শ্লক্ষ্ণ'* গুণের সৃষ্টি হয়।[২৪]

উচ্চস্বরে উচ্চারিত সুস্পষ্ট গানই হল **'বিকৃষ্ট'**।[২৫] **বিকৃষ্ট'** বলতে যে গান বিশেষভাবে আকর্ষণ করবে। সুতরাং সুস্পষ্টভাবে উচ্চারিত হওয়াটাই স্বাভাবিক। না হলে কেনই বা আকর্ষিত হবে। এখানে সংগীতরত্নাকর রচয়িতা শার্ঙ্গদেব পূর্বাচার্য ভারতের নাম উল্লেখ করে তাঁর প্রতি ঋণ স্বীকার করেছেন।

'মধুর'[২৬] গুণের দ্বারা শার্ঙ্গদেব লাবণ্যপূর্ণ ও চিত্তাকর্ষক গানকেই বুঝিয়েছেন।

আনুমানিক একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর সংগীত শার্ঙ্গদেব তাঁর পূর্ববর্তী আচার্য নারদের কথাই অনুসরণ করে দশটি গুণের কথা বলেছেন। কেবল নামেই একটু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। 'রক্ত' গুণের স্থানে 'সুরক্ত' এবং 'বিক্রুষ্ট' গুণের স্থানে 'বিকৃষ্ট'। কিন্তু, প্রত্যেক গুণের সংজ্ঞা নারদীয় শিক্ষার অনুরূপ। সেক্ষেত্রে নারদীয় শিক্ষার তাৎপর্য অনেকখানি বলে মনে হয়। কারণ, খ্রীষ্টপূর্বযুগের এক সংগীতশাস্ত্রীকে প্রায় হাজার বছর পরের এক সংগীতশাস্ত্রী অনুসরণ করে চলেছেন।

সংস্কৃত সাহিত্যের একটি প্রহসন মৃচ্ছকটিক। এটি সংগীতশাস্ত্র ভিন্ন একটি গ্রন্থ। গ্রন্থের রচয়িতা হলেন শূদ্রক। গানের এক চিত্তাকর্ষক লক্ষণ দিয়েছেন গ্রন্থকার শূদ্রক। বলেছেন -

রক্তং চ নাম মধুরং চ সমং স্ফুটং চ।
ভাবান্বিতং চ ললিতং চ মনোহরং চ।।[২৭]

নাটকটির নায়ক, পণ্ডিত রেভিলের গান শুনে এমন মন্তব্য করেছেন। রেভিল কৃত গানের বিশেষণগুলি এই শ্লোকে পরিস্ফূট হয়েছে। যার অর্থ - অনুরাগপূর্ণ, মধুর, শ্রুতি সুখকর, সুর-তাল-লয়ে শুদ্ধ, স্পষ্ট, নানাভাব যুক্ত সুন্দর এবং মনোহারী গান। এখানে শূদ্রক সাতটি গুণের কথা উল্লেখ করেছেন।

দোষ

গানের গুণ বলার পর বিপরীতমুখে দোষের কথাও বলা প্রয়োজন। তাই, প্রায় সমস্ত সংগীতশাস্ত্রকারেরা গুণ ও দোষ - উভয়েরই লক্ষণ নির্ণয়ে প্রয়াসী হয়েছেন। নারদীয় শিক্ষায় গীতিদোষ সম্বন্ধে বলা হয়েছে —

শঙ্কিতং ভীতমুদ্ঘুষ্টমব্যক্তমনুনাসিকম্।
কাকস্বরং শিরসিগতং তথা স্থানবিবর্জিতম্।।
বিস্বরং বিরসং চৈব বিশ্লিষ্টং বিষমাহতম্।
ব্যাকুলং তালহীনং চ গীতিদোষাশ্চতুর্দশ।।[২৮]

অর্থাৎ শঙ্কিত, ভীত, উদ্ঘুষ্ট বা ক্ষুব্ধ, অব্যক্ত বা অপরিস্ফুট, অনুনাসিক, কাকস্বর অর্থাৎ কণ্ঠের মধ্যে পীড়াজনক স্বর, শীর্ষগত, স্থানবিবর্জিত বা স্থানচ্যুত, বিস্বর, বিরস, বিচ্ছিন্ন, বিষমাহত, ব্যাকুল, তালহীন চতুর্দশ গীতিদোষ। এখানে শুধু নাম উল্লেখ করেই গ্রন্থান্তরের আলোচনায় নিবিষ্ট হওয়াই ভাল।

স্থানাঙ্গসূত্রে বলা হয়েছে —

ভীতং দুতং রহস্সং, গায়কো মা য গাহি উত্তালং।
কাকস্সরমণুণাসং, চ হোংতি গেয়স্স ছদ্দোসা।।[২৯]

অর্থাৎ ভীত, দ্রুত, হ্রস্ব, উত্তাল, কাকস্বর, অনুনাসিক - এই ছয়টি দোষ। আগমের ছয়টি গীতিদোষ নারদীয় শিক্ষার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। স্থানাঙ্গসূত্রের **'ভীতদোষ'**, নারদীয় শিক্ষার **'শঙ্কিত'** ও **'ভীত'** দোষের অন্তর্ভুক্ত। নারদ, শিক্ষাগ্রন্থে 'শঙ্কিত' ও 'ভীত' দোষকে পৃথক ভাবে ব্যাখ্যা করলেও দুটি সমপর্যায়ভুক্ত।

'দ্রুতদোষ' নারদীয় শিক্ষার **'তালহীন'** দোষের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। **'তালহীন'** দোষে শিক্ষাকার নারদ বলেছেন, প্রত্যেক গানের যে ছন্দঃ থাকে, সেই গান সেই ছন্দেই গাওয়া উচিত। কোনোটি দ্রুত বা কোনোটি বিলম্বিত নয়। তাই যার যা বৈশিষ্ট্য

সেই লয়েই গান করা কর্তব্য। দ্রুততার সঙ্গে করণীয় নয় - এমনটাই স্থানাঙ্গসূত্রের বক্তব্য।

নারদীয় শিক্ষার '**বিষমাহত**'[৩০] (distintegrated) দোষটি আগম গ্রন্থের '**হ্রস্বদোষ**'। 'বিষমাহত' এর অন্তর্গত হ্রস্ব-দীর্ঘ-দ্রুত স্বরের বিলম্বিতভাবে স্থাপনার ব্যাপার আছে। আর, আগমে কেবল হ্রস্বদোষের কথা বলা হয়েছে।

নারদ, যে 'তালহীন' দোষের কথা বলেছেন, স্থানাঙ্গসূত্রের সেটিই 'উত্তাল' দোষ। অর্থাৎ যে গান তাল-লয় যুক্ত নয়।

'কাকস্বর' দোষ উভয় গ্রন্থেই স্থান পেয়েছে। যার অর্থ কাক যেমন কণ্ঠ নিষ্পীড়নের মাধ্যমে কর্কশ আওয়াজ করে, ঠিক তেমনি কর্কশ স্বর যুক্ত গান করা গীতিদোষের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

'**অনুনাস**' বা '**অনুনাসিক**' দোষ উভয় গ্রন্থেই বিদ্যমান। নাসিকার দ্বারা শব্দ উচ্চারণের মাধ্যমে গান করা সমীচীন নয়। যদি হয়ে থাকে, তবে অনুনাসিক দোষে দুষ্ট হবে।

ভরতের নাট্যশাস্ত্রে দোষ বিষয়ে বলা হয়েছে -

কপিলোৎব্যবস্থিতশ্চৈব তথা সন্দষ্ট এব চ।
কাকী চ তুম্বকী চৈব পঞ্চদোষা ভবন্তি হি।।[৩১]

অর্থাৎ কপিল, অব্যবস্থিত, সন্দষ্ট, কাকী, তুম্বকী - এই পাঁচটি দোষ। যখন কণ্ঠস্বর অস্বাভাবিক হয় এবং ঘর্ঘর শব্দযুক্ত হয়, তখন হয় **কপিল**। যার কণ্ঠে কফ থাকে, তারই স্বর '**কপিল**'[৩২] নামে অভিহিত হয়। যে স্বরে অনিয়মিত আতিশয্য বা প্রাচুর্যহীনতা থাকে, তাকে '**অব্যবস্থিত**' বা '**অস্থিত**'[৩৩] নামে অভিহিত করা হয়। এককথায়, ক্ষীণ স্বরযুক্ত গানই 'অস্থির' বা 'অব্যবস্থিত' দোষে দুষ্ট হয়ে পড়ে। দন্তের প্রয়োগ থেকেই '**সন্দষ্ট**'[৩৪] নামকরণ করেছেন আচার্যগণ। দন্তের প্রয়োগ বলতে এখানে অত্যধিক প্রয়োগ বুঝতে হবে। কারণ, অত্যধিক দাঁতের প্রয়োগ হলে গান স্পষ্ট হয় না। স্বর যখন উপযুক্তস্থানে উচ্চারিত হয় না এবং যখন কর্কশ হয়ে যায়, তখন তাকে '**কাকী**'[৩৫] সংজ্ঞায় অভিহিত করা হয়। যে স্বর নাসিকার সাথে অনাবশ্যকভাবে সম্পৃক্ত হয়ে উচ্চারিত হয়, তার নাম '**তুম্বকী**'।[৩৬]

নাট্যশাস্ত্রে যে দোষের কথা বলা হয়েছে, তা অতি সাধারণ ও সচরাচর লক্ষ্যও করা যায়। তাই ভরত বিশেষ কোনো দোষের কথা না বলে সাধারণ দোষের কথাই ব্যক্ত করেছেন। প্রথম যে দোষের কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ 'কপিল' দোষ, সেটি নারদীয় শিক্ষার 'অব্যক্ত' দোষের সমতুল্য। দ্বিতীয় দোষটি অর্থাৎ 'অব্যবস্থিত', সেটি নারদীয় শিক্ষার 'বিচ্ছিন্ন' (discontinuing) দোষের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। চতুর্থ ও পঞ্চম অর্থাৎ 'কাকী' ও 'তুম্বকী' দোষের সঙ্গে নারদীয় শিক্ষার যথাক্রমে 'কাকস্বর' ও 'অনুনাসিক' দোষ দুটি সমপর্যায়ভুক্ত। অতএব, এই ব্যাখ্যার জন্য নারদীয় শিক্ষার ব্যাখ্যার প্রতি দৃষ্টি দেওয়াই ভালো। নাট্যশাস্ত্রে তৃতীয় যে দোষ অর্থাৎ 'সন্দষ্ট' দোষ দেখানো হয়েছে, তা নারদীয় শিক্ষা বা স্থানাঙ্গসূত্রে দেখা যায় না। তবে শিক্ষাকার নারদ সামগানকারী গায়কদের জন্য যেসব নিয়মাবলী বলেছেন, সেখানে দাঁত চেপে বর্ণোচ্চারণের নিষেধ করা হয়েছে। যেটি দোষেরই অন্তর্ভুক্ত। অতএব নাট্যশাস্ত্রকার যা বলেছেন, তার সবগুলিই শিক্ষাকারের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

বৃহদ্দেশীকার মতঙ্গমুনি গীতির গুণাবলী না বললেও, গীতিদোষ উল্লেখ থেকে বিরত থাকেন নি। গীতিদোষ বিষয়ে বলেছেন —

লোকদুষ্টং শাস্ত্রদুষ্টং পুনরুক্তং চ বর্জয়েত্।
ছন্দোদুষ্টং তথা গ্রাম্যং গতক্রমমপার্থকম্।।
পদং চার্থং তু সন্দিগ্ধং কলাবাহ্যং কলাবাহ্যং বিভক্তকম্।[৩৭]

সংগীতরত্নাকারে শার্ঙ্গদেব বলেছেন —

দুষ্টং লোকেন শাস্ত্রেণ শ্রুতিকালবিরোধি চ।
পুনরুক্তং কলাবাহ্যং গতক্রমমপার্থকম্।।
গ্রাম্যং সন্দিগ্ধমিত্যেবং দশধা গীতদুষ্টতা।[৩৮]

অর্থাৎ দশটি গীতিদোষ - লোকদুষ্ট, শাস্ত্রদুষ্ট, শ্রুতিবিরোধী, পুনরুক্ত, কলাবাহ্য, গতক্রম, অপার্থক, গ্রাম্য ও সন্ধিগ্ধ।

শার্ঙ্গদেবের গীতিদোষের লক্ষণ দেখলে মনে হয়, তিনি মতঙ্গ মুনিকেই অনুসরণ করেছেন। তবে, বৃহদ্দেশীকার মতঙ্গ মুনি কেবলমাত্র গীতিদোষ সম্পর্কেই গায়কদের সচেতন করেছেন। অর্থাৎ দোষগুলি বর্জন করলেই গান স্বাভাবিকভাবেই গুণযুক্ত হবে -- এই ছিল বৃহদ্দেশীকারের অভিমত। সেই দিক থেকে শার্ঙ্গদেব বৃহদ্দেশীকারকে সম্পূর্ণরূপে অনুসরণ না করে গীতিগুণের কথা বলে গায়কদের সচেতনতা বৃদ্ধি করেছেন। এক্ষেত্রে মনে হয়, বৃহদ্দেশীকার মতঙ্গ একটু আধুনিকতার সঙ্গেই কেবলমাত্র দোষের কথা উল্লেখ করেছেন। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার অনেক পদ্ধতিতেই প্রথম পর্যায়ে নঞর্থক অর্থাৎ না-বাচকগুলি প্রত্যাখ্যান করতে করতে হ্যাঁ-বাচক ধারণাতে পৌঁছে যেতে হয়। আবার নীতিশিক্ষার গল্পগুলি দেখলে দেখা যায়, না-বাচক ও হ্যাঁ-বাচক - উভয় ধারণারই কথা আছে। যেমনটি শিক্ষা, স্থানাঙ্গসূত্র, নাট্যশাস্ত্র ও সংগীতরত্নাকরে পাওয়া যাচ্ছে।

বর্তমান সংগীত শিল্পীদের গানের গুণ ও দোষের কথা জানার খুবই প্রয়োজন। কেউ কেউ আছেন যারা এই গুণের অধিকারী। কিন্তু, অনেকে আছেন যাদের গান অনেক দোষেই দুষ্ট। তারা যদি দোষগুলি বর্জন করতে পারেন, তবে তাদের গান আরো বেশী করে হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠবে ও সর্বজনগ্রাহ্য হবে, যে বিষয়ে কোনো সংশয় নেই।

যে সব সংগীতশাস্ত্রের গীতি গুণ ও দোষের কথা আলোচনা করা হল, সেগুলির একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হল —

নারদীয় শিক্ষা

গুণ	দোষ
১। রক্ত, ২। পূর্ণ, ৩। অলংকৃত, ৪। প্রসন্ন,	১। শঙ্কিত, ২। ভীত, ৩। ডদ্ঘৃষ্ট,
৫। ব্যক্ত, ৬। বিক্রুষ্ট, ৭। শ্লক্ষ্ণ, ৮। সম ৯। সুকুমার, ১০। মধুর।	৪। অব্যক্ত, ৫। অনুনাসিক, ৬। কাকস্বর, ৭। শীর্ষগত, ৮। স্বস্থান বিবর্জিত, ৯। বিস্বর, ১০। বিশ্লিষ্ট, ১১। বিরস, ১২। বিষমাহত, ১৩। ব্যাকুল, ১৪। তালহীন।

স্থানাঙ্গসূত্র

গুণ	দোষ
১। পূর্ণ, ২। রক্ত, ৩। অলংকৃত, ৪। অবিঘুষ্ট ৫। মধুর, ৬। সম, ৭। সুকুমার, ৮। ব্যক্ত ৯। উরোবিশুদ্ধ, ১০। কণ্ঠবিশুদ্ধ, ১১। শিরোবিশুদ্ধ, ১২। মৃদু, ১৩। রিভিত, ১৪। পদবদ্ধ, ১৫। সমতালপাদোৎক্ষেপ, ১৬। সপ্তস্বরসীভর। **গেয়পদের গুণ** ১। নির্দোষ, ২। সারবন্ত, ৩। হেতুযুক্ত, ৪। অলংকৃত, ৫। উপনীত, ৬। সোপচার ৭। মিত, ৮। মধুর	১। ভীত, ২। দ্রুত, ৩। হ্রস্ব, ৪। উত্তাল, ৫। কাকস্বর, ৬। অনুনাসিক।

বৃহদ্দেশী

গুণ	দোষ
উল্লেখ নেই	১। লোকদুষ্ট, ২। শাস্ত্রদুষ্ট, ৩। পুনরুক্ত, ৪। ছন্দোদুষ্ট, ৫। গ্রাম্য, ৬। গতক্রম ৭। অপার্থক, ৮। পদ, ৯। সন্দিগ্ধ, ১০। কলাবাহ্য।

সংগীতরত্নাকর

গুণ	দোষ
১। ব্যক্ত, ২। পূর্ণ, ৩। প্রসন্ন, ৪। সুকুমার, ৫। অলংকৃত, ৬। সম, ৭। সুরক্ত, ৮। শ্লক্ষ্ণ, ৯। বিকৃষ্ট, ১০। মধুর	১। লোকদুষ্ট, ২। শাস্ত্রদুষ্ট ৩। শ্রুতিবিরোধী, ৪। কালবিরোধী, ৫। পুনরুক্ত, ৬। কলাবাহ্য, ৭। গতক্রম ৮। অপার্থক, ৯। গ্রাম্য, ১০। সন্দিগ্ধ

সূত্র-সংকেতঃ

১. *গানস্য তু দশবিধা গুণবৃত্তিস্তদ্যথা — রক্তং পূর্ণমলংকৃতৎ প্রসন্নং ব্যক্তং বিকৃষ্টং / শ্লক্ষং সমং সুকুমারং মধুরমিতি গুণাঃ (না.শি.- ১.৩.১)*

২. *স্থান. সূ. - ৭.৪৮.৬*

৩. *উর-কংঠ-সির-বিসুদ্ধং, চ গিজ্জতে ময়উ-রিভিতা-পদবংদ্ধ।/সমতালপদুক্খেবং, সত্তসরসীহরং গেয়ং।(স্থান. সূ. - ৭.৪৮.৭)*

৪. *ণিদ্দোসং সারবংতং চ, হেউজুত্তমলংকিয়ং।/উবণীতং সোবরায়ং চ, মিতং মধুরমেব য।।(স্থান. সূ. - ৭.৪৮.৮)*

৫. *অনাগতমতিক্রান্তং বিচ্ছিন্নং বিষমাহতম।/তন্বন্তমস্থিতান্তং চ বর্জয়েত কর্ষণং বধুঃ।(না.শি. ১.৬.১৯)*

৬. *না.শা. - ৩২.৪৯৩।*

৭. *তদেব - ৩২.৪৯২।*

৮. *না.শি. - ১.৩.৬।*

৯. *না.শা. - ৩২.৫১৪।*

১০. *দূরাত শ্রূয়তে যস্মাত তস্মাচ্ছ্রবক উচ্যতে ।(না.শা. - ৩২.৫১৫ক)*

১১. *শ্রাবীকো সুস্বরো যস্তু ন বিক্ষিপ্তো ঘনঃ স্মৃতঃ।।(তদেব-খ)*

১২. *সুশ্রবঃ স ত্বপরুষঃ স্নিগ্ধস্তজ্ঞৈজ্ঞকঃ প্রকীর্তিতঃ।(তদেব - ৩২.৫১৬ক)*

১৩. *মহাস্থানেঽ প্যবৈস্বর্যং স বৈ মধুর উচ্যতে।(তদেব-খ)*

১৪. *স্বরেহধিকে চ হীনে চ হ্যবিরক্তোহবধানবান।(তদেব - ৩২.৫১৭ক)*

১৫. *শিরঃকণ্ঠেষ্বভিহতঃ (তৎ) স্থানমধুরস্বরৈঃ।।/ত্রিস্থানেঽপি হি মাধুর্যং যস্য নিত্যং বিধীয়তে।।/ত্রিস্থানশোভীত্যেবং তু তজ্জৈজ্ঞঃ প্রকীর্তিতঃ (তদেব - ৩২.৫১৭ খ-৫১৮)*

১৬. *সং. রত্না., প্রবন্ধাধ্যায় - ৩৭৪।*

১৭. *দশৈতে .. ব্যক্তং স্ফুটং স্বরৈঃ...।। (তদেব - ৩৭৫)*

১৮. *পূর্ণং পূর্ণাঙ্গমকম।(তদেব - ৩৭৬)*

১৯. *প্রসন্নং প্রকটার্থম।(তদেব)*

২০. *সুকুমারং কণ্ঠভবম্।(তদেব)*

২১. *ত্রিস্থানমোত্থমলংকৃতম।(তদেব)*

২২. *সমবর্ণলয়স্থানং সমমিত্যভিধীয়তে।(তদেব - ৩৭৭)*

২৩. *সুরক্তং বল্লকীলংশকণ্ঠধ্বন্যেকতাযুক্তম (তদেব)।*

২৪. *নীচোচ্চদ্রুতমধ্যদৌ শ্লক্ষত্বে শ্লক্ষমুচ্যতে (তদেব - ৩৭৮)*

২৫. *উচ্চৈরুচ্চারণাদুক্তং বিকৃষ্টং ভরতাদিভিঃ (তদেব)*

২৬. *মধরং মাধুর্যলাবণ্যপূর্ণং জনমনোহরম্।(তদেব)*

২৭. *মৃচ্ছ. - ৩য় অঙ্ক*

২৮. *না.শি. ১.৩.১২-১৩।*

২৯. *স্থান.সূ. - ৭.৪৮.৫।*

৩০. *প্লুতস্য দীর্ঘহ্রস্বয়োশ্চ বিলম্বিতং পাতনং বিষমাহতম।(না.শি. - ১.৩.১৩ টীকা)*

৩১. *না.শা. ৩২.৫১৯*

৩২. *বৈস্বর্যং চ ভবেৎ যত্র তথা স্যাদ।(ঘর্ঘরায়িতম)/ কপিলঃ স তু বিজ্ঞেয়ঃ শ্লেষ্মকণ্ঠস্তথৈব চ।।(তদেব ৩২.৫২০)*

৩৩. *ঊনতাধিকতা বাপি স্বরাণাং যত্র দৃশ্যতে।/কৃশত্বদোষতশ্চৈব জ্ঞেয়ঃ স ত্বব্যবস্থিততঃ।।(তদেব ৩২.৫২১)*

৩৪. *দন্তপ্রয়োগাত সন্দষ্টঃ স্বাচার্যৈঃ পরিকীর্তিতঃ।(তদেব ৩২.৫২২ক)*

৩৫. *যো ন নিস্তরতি স্থানে স্বরমুচ্চারণগতম্।/তথারূক্ষস্বরশ্চৈব স কাকীত্যভিসংজ্ঞিতঃ (তদেব ৩২.৫২২খ-৫২৩ক)*

৩৬. *নাসাগতস্বরো যস্তু তুম্বকী সোঽভিধীয়তে (তদেব ৩২.৫২৩খ)*

৩৭. *বৃহ. ৬.৪৯০*

৩৮. *সং. রত্না. ৪.৩৭৯*

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জিঃ

নাট্যশাস্ত্র, ভরতকৃত (১-৪র্থ সংখ্যা)। সম্পা - সুরেশ চন্দ্র ব্যানার্জী। কলকাতা; নবপত্র প্রকাশন, ২০১৪ (৬ষ্ঠ মুদ্রণ)

নারদীয়শিক্ষা। সম্পা. - দীধিতি বিশ্বাস। কলকাতা, প্যাপিরাস, ২০০০।

নারদীয়শিক্ষা, নারদকৃত। সম্পা. - প্রদীপ কুমার ঘোষ। রিসার্চ ইনস্টিটিউট অব ইণ্ডিয়ান মিউজকলজি, ২০১০।

মৃচ্ছকটিক, শূদ্রককৃত। সম্পা. - অবিনাশ চন্দ্র দে ও শুভেন্দু কুমার সিদ্ধান্ত। কলকাতা ঃ সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ১৪১৩ (দ্বিতীয় সংস্করণ)।

সংগীতরত্নাকর, শার্ঙ্গদেবকৃত। বঙ্গানুবাদ - সুরেশ চন্দ্র ব্যানার্জী। কলকাতা ঃ রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৪১৮।

Brhaddeśí of Mataṅga Muni (2 vols). Ed. by Prem Lata Sharma, Delhi : Indira Gandhi National Centre for the Arts, 1992.

Sthānāngasūtra of Sudhakara Swami, Ed. by Mdhukara Muni, Delhi : Sri Agam Prakashan Samiti Jain, Sthanak, 1981.

শতবর্ষী পদাতিক

ড. বাসন্তী ভট্টাচার্য

[**বিষয়-চুম্বক** ঃ *কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় নামটি বাংলা সাহিত্যের জগতে সুপরিচিত। 'পদাতিক' কাব্যগ্রন্থের মাধ্যমে তাঁর পদপাত বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে। পায়ে পায়েই তিনি চিনে নিয়েছিলেন সাধারণ মানুষের জীবন ও যাপনকে। তাঁর বিশিষ্ট রাজনৈতিক বিশ্বাস কেবলই কাগুজে না। শ্রমিক বস্তিতে জীবনযাপন আক্ষরিক অর্থেই তাঁকে পদাতিক কবি করে তুলেছিল। অজস্র কবিতা নিয়ে তৈরি হয়েছে তাঁর একাধিক কাব্যগ্রন্থ, রিপোর্টাজ, উপন্যাস নিয়ে গড়ে উঠেছে গদ্যসম্ভার, আছে ছড়া এবং আছে অনবদ্য অনুবাদ সাহিত্য। সব মিলিয়ে শতবর্ষ পেরিয়ে আজও বাংলা সাহিত্যে উজ্জ্বল নক্ষত্র শতবর্ষী সুভাষ মুখোপাধ্যায়।*

সূচক-শব্দ ঃ *কবি, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, পদাতিক, কর্মী, সাহিত্য, কবিতা, রাজনৈতিক, পার্টি, মানুষ*]

কবি জীবনানন্দ দাশ তাঁর 'কবিতার কথা' গ্রন্থে বলছেন, ''কবির বিশ্বাস বা তার অভাবে অতিপ্রবণতার দোষ রয়েছে কিনা টের পাওয়া যাবে তার কবিতা পড়লে। সৎ কবিতায় মোটামুটি বোধ করতে পারা যাবে কবি নিজে কি বিশ্বাস করে না করে; কিন্তু সে কবিতায় যে সত্য ব্যক্ত হয়েছে সেইখানেই কবি নিজে অনুভব করে যে সে পাঠকের মর্মে হাত রাখতে পেরেছে।''[১] পাঠকের মর্মে হাত রেখেই কবিতার পথে আমৃত্যু (৮ই জুলাই, ২০০৩) হেঁটেছেন পদাতিক কবি শ্রী সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের পথচলা শুরু হয়েছিল ১৯১৯ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে। যদিও পৈতৃক বাড়ি ছিল কুষ্টিয়ার লোকনাথপুর। মা ছিলেন যামিনী দেবী। পিতা ক্ষিতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের আবগারি দপ্তরের সরকারি চাকরির সুবাদে কবির ছেলেবেলা কেটেছে পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে। শৈশবে পড়েছেন রাজশাহীর নওগাঁর স্কুলে, তারপর কলকাতার মেট্রোপলিটান ইন্সটিটিউশন এবং সত্যভামা ইন্সটিটিউশনে। শৈশব থেকেই এসেছেন নানা মানুষের সংস্পর্শে। একদিকে পূর্ববঙ্গের খোলা প্রকৃতি আর তার সাথে হিন্দু-মুসলমান ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের সঙ্গে মেলামেশার পরিসর তৈরি করেছিল তাঁর ব্যক্তিত্বের ভিত। কলকাতায় আসার পর ম্যাট্রিক পাশ করেন ভবানীপুরের মিত্র ইন্সটিটিউশন স্কুল থেকে। তাঁর স্কুলের সহপাঠী ছিলেন পরবর্তী কালের বিখ্যাত গায়ক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

আশুতোষ কলেজ এবং স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে পাশ করে বেরোনোর আগেই যোগাযোগ ঘটে গেছে রাজনীতির সঙ্গে। বামপন্থী ছাত্ররাজনীতিতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন এবং রাজনীতির চর্চার দ্বারাই যে সমাজের বদল আনা সম্ভব ক্রমশ এই বিশ্বাস দৃঢ় হতে থাকে। ফলে শখের বা প্রাপ্তিযোগের উদ্দেশ্যে রাজনীতিচর্চা না, বরং সক্রিয় কর্মী হয়ে ওঠেন রাজনীতিতে। আসলে মানবতার এবং দেশাত্মবোধের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িয়ে ছিল সুভাষের রাজনীতির বোধ। আই.এ. পড়ার সময় বন্ধু সমর সেনের কাছ থেকে পাওয়া 'হ্যান্ডবুক অফ মার্কসিজম' পড়ে আকৃষ্ট হন মার্কসিজম এর প্রতি। ১৯৪১ সালে স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করে বেরনোর পরে ১৯৪২ সালে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন। আপন রাজনৈতিক বিশ্বাসের প্রতি ভালোবাসায় ১৯৪৮ সালে পার্টি বেআইনি ঘোষিত হলে কারাবরণ করতেও দ্বিধাবোধ করেন না। রাজনৈতিক আদর্শের প্রতি ঐকান্তিক ভালবাসার কারণেই বুঝি জীবনের পরবর্তী দিনগুলিতে দেখি সুভাষ মুখোপাধ্যায় সরে এসেছিলেন পার্টির সংশ্রব থেকে। সমালোচিত হয়েছেন, নিন্দিত হয়েছেন তবু অটল থেকেছেন আপন বিশ্বাসে। আসলে তাঁর কাছে রাজনীতির চর্চা ব্যক্তিগত পরিসরের বিষয় ছিল না, সমস্ত মানুষের দারিদ্র্য থেকে মুক্তিলাভের পথ, সার্বিকভাবে

Dr. Basanti Bhattacharya, Associate Professor, Dept of Bengali, Uluberia College, Howrah

ভাল থাকার পথ বলেই বিশ্বাস ছিল। তাঁর আজীবনের সাহিত্য সাধনা সেই বিশ্বাসের কথাই প্রতিষ্ঠিত করে। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম লেখা 'কথিকা' প্রকাশিত হয় সত্যভামা ইন্সটিটিউশনের স্কুল ম্যাগাজিন 'ফল্গু'তে। তেইশটি কবিতার সঙ্কলন তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'পদাতিক' প্রকাশিত হয় ১৯৪০ সালে 'কবিতাভবন' থেকে। তাঁর কলমের স্বকীয়তা ধরা পড়ে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থেই। আশ্চর্যজনক ভাবে প্রথম কাব্যগ্রন্থেই তিনি পরিহার করেন প্রেম ও প্রকৃতিকে। চিরাচরিত প্রথার বদলে প্রথম পদক্ষেপেই তিনি পাঠককে আহ্বান জানিয়েছেন রণসজ্জা গ্রহণের। বলা যায় প্রথম রচনাতেই স্পষ্ট হয়ে যায় কবির সমাজবদলের বৈপ্লবিক চিন্তাভাবনা। বিষয়ের সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই কবিতার ভাষা প্রয়োগ এবং ছন্দকুশলতায় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

রাজনীতিতে তাঁর আগ্রহ কেবলই তত্ত্বগত ছিল না। ছাত্রআন্দোলন এবং খিদিরপুরের ডক অঞ্চলের শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্তির সূত্রেই বৃহত্তর রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন। রাজনীতি না লেখালেখি কোনটা অনুসরণ করবেন এই দ্বন্দ্বে তিনি প্রাথমিক ভাবে বেছে নেন রাজনীতিকে। তাই দেখি 'পদাতিক'-র পরে দীর্ঘকাল কোন সাহিত্য সৃষ্টি হয় নি তাঁর কলমে। কিন্তু নাজিম হিকমত বা পাবলো নেরুদার মতো একাধারে রাজনৈতিক কর্মী এবং কবির কাজ তাঁকে উদ্বুদ্ধ করে কলম ধারণে। রাজনৈতিক কাজের সঙ্গে যে সাহিত্য রচনার কোন বিরোধ নেই তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বরং একথাও স্পষ্ট হয় যে, কবিতাই হয়ে উঠতে পারে তাঁর হাতের অস্ত্র। তাই দেখি ১৯৪২ সালে সোমেন চন্দের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের যুগ্ম সম্পাদক হন (সহসম্পাদক বিষ্ণু দে)। পার্টির কাজে ঘুরে বেড়ান বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলগুলিতে। এই সময়ের অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ তাঁর পরবর্তীকালের সাহিত্য। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫০ এর মধ্যে দুদফায় প্রায় দুবছর জেল খাটেন রাজনৈতিক বন্দী হিসাবে। ১৯৪৮ এ প্রকাশিত হয় মাত্র ৫ টি অ্যান্টি- ফ্যাসিস্ট কবিতার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ 'অগ্নিকোণ'। নাম-কবিতায় দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার গণঅভ্যুত্থানকে কবি কাব্যরূপ দিলেন। কবিতার চরিত্রধর্মে একে কাব্যের বদলে কাব্যপুস্তিকা বলাই বুঝি সঙ্গত। ১৯৫০ সালে প্রকাশিত হয় 'চিরকুট' নামের কাব্যগ্রন্থ। বস্তুত ১৯৪০ থেকে ১৯৪৮ এর 'অগ্নিকোণ' এর পূর্ব পর্যন্ত লিখিত কবিতার সঙ্কলন এটি। সারা পৃথিবীর নিপীড়িত মানুষের বেঁচে থাকার সংগ্রামের বাণী ধ্বনিত হয়েছে এই কাব্যগ্রন্থে। পদাতিক কবি যে পথ খুঁজেছিলেন সেই পথের সন্ধান বুঝি পেয়েছিলেন তাঁর জীবনচর্যায়। সমস্ত শোষিত, বঞ্চিত মানুষকে রাজনীতি সচেতনতার সেই পথের সন্ধান কবি দিয়েছিলেন তাঁর কাব্যগ্রন্থের অক্ষরে অক্ষরে।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় ছিলেন এমন একজন মানুষ যাঁর জীবনবোধ, রাজনীতি, সামাজিক অস্তিত্ব এবং লেখালেখি ছিল পরস্পরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে।তাঁর ভাবনায় সবার আগে ছিল মানুষ ও মানুষের সমস্যা, তত্ত্বের আগে ছিল জীবন, নিছক কলম চালনার আগে ছিল দেশ। তিনি বিশ্বাস করেছেন এবং বলেছেন, ''দেশের বাড়ি খুইয়ে আমি পেয়েছি বিশাল এক দেশ, আসমুদ্রহিমাচল আমার কাছে অবারিত দ্বার। আমার এই হরবোলা শহরের দর্পণে আমি দেখি সারা দেশের মুখ।''[২] অনেকগুলো বছর পরে 'দর্পণে' তাঁর আকাঙ্খিত দেশ ও দেশের মানুষের মুখ দেখতে না পেয়েই বুঝি হেঁটেছিলেন স্রোতের বিপরীতে। তাঁর কাছে রাজনীতি মানে প্রাপ্তি ছিল না, রাজনীতি মানে ছিল পোস্টার লেখা, দেওয়াল লিখন, মিছিলে পা মেলানো আর কারখানা, খেতখামার, বস্তিতে, কুঁড়ে ঘরে সাধারণ মানুষের সাথে তাদের মাপের জীবনকে তাদের সাথেই ভাগ করে নেবার অভিজ্ঞতা। যথার্থ অর্থেই তিনি ছিলেন 'পদাতিক' কবি। চলার পথেই যে ছড়িয়ে আছে তাঁর লেখার উপকরণ। তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে বলা – পায়ে ব্যথা তাই আর কবিতা লিখতে পারছেন না বা পা-ই তাঁর কাছে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় – কথাগুলি যেন আর নিছক রসিকতা থাকে না, আক্ষরিক অর্থেই সত্য হয়ে ওঠে। তাই বুঝি বলতেন তাঁদের বাড়িতে বসার ঘর ছিল না, রাস্তাই ছিল দারুণ বাইরের ঘর, কেউ ডাকলেই যাতে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসতে পারেন। সত্যিই তিনি ঘুরে বেরিয়েছেন কেবল দেশে নয় বিদেশেও, লক্ষ্য একটাই – সাধারণ মানুষকে জানা ও চেনা। সারাটা জীবন কাটিয়েছেন সাধারণ মানুষের সঙ্গেই। নিজেকে সর্বক্ষণের পার্টিকর্মী অর্থাৎ পার্টির হোল-টাইমার রূপে নিয়োজিত করে পাটিকর্মীর বরাদ্দ অতি সামান্য টাকায় দিন গুজরান করেছেন। স্থির করেছেন কোন জীবিকা নয় কেবল লিখেই জীবন চালাবেন। একদিকে পার্টির মুখপত্র 'জনযুদ্ধ' আর 'স্বাধীনতা'য় সাংবাদিকতা করেছেন, অন্যদিকে চালিয়েছেন নিজের কলম। পরম যত্নে প্রুফ দেখেছেন আবার হকারিও করেছেন। তিনি ও তাঁর সাহিত্যিক সহধর্মিণী শ্রীমতি গীতা মুখোপাধ্যায় দুজনে মিলে জীবনের দুঃখ, ভয়, অভাব সবকিছু হেলায় হারিয়ে দিয়ে লালন করেছেন পালিত সন্তানদের, যাপন করেছেন ক্লিষ্টতাহীন এক উজ্জ্বল জীবন। সুভাষ মুখোপাধ্যায় ছিলেন একাধারে কর্মী ও কবি। তাই বুঝি তাঁর বেশ কিছু কবিতায় দেখি কবিতাই যেন রাজনৈতিক আদর্শ প্রচারের ভূমিকা পালন করেছে। 'সকলের গান' কবিতায় বলেছেন,

কমরেড, আজ নবযুগ আনবে না ?

কুয়াশাকঠিন বাসর যে সম্মুখে

লাল উল্কিতে পরস্পরকে চেনা —

দলে টানো হতবুদ্ধি ত্রিশঙ্কুকে,

কমরেড, আজ নবযুগ আনবে না ?

কবির চোখে প্রকৃতির সৌন্দর্য ধরা পড়ে কিন্তু মানুষের কষ্টের ছবিতে যার দুচোখ ভরা সেই কবি আসানসোলে প্রকৃতির পাশে দেখেন সাধারণ মানুষের তৈরি কারখানার চিমনি আর কামারশালা।

'এখানে' কবিতায় লিখছেন ,

এখানে আকাশ পাহাড়ের গায়

পড়েছে ভেঙে,

পাহাড়ের গায় সারি সারি সব

চিমনি চুড়ো।

ধানের জমিরা সব পাশাপাশি শুয়ে

দিগ্বিদিক —

খাড়া করে কান কাস্তের শান

শুনছে নাকি

কামারশালে ?

কবির রাজনৈতিক বিশ্বাস নিছক কাব্যপ্রীতির উপকরণ নয়, প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দিনেও তাঁর কলম ভয়হীন। 'চীন ঃ ১৯৩৮ কবিতায় বলছেন,

জাপপুষ্পকে ঝরে ফুলঝুরি, জ্বলে হ্যাংকাও

কমরেড, আজ বজ্রে কঠিন বন্ধুতা চাও

লাল নিশানের নীচে উল্লাসী মুক্তির ডাক

রাইফেল আজ শত্রুপাতের সম্মান পাক।

সংগ্রামে বিশ্বাসী কবি দেখেছেন জীবনের হীনতা, দেখেছেন অভাবী মানুষের একজোট হওয়ার ভয় ও সেই ভয়জাত হীন ষড়যন্ত্র কিন্তু ভালোবাসায় বিশ্বাসী কবির কাছে বড় হয়ে উঠেছে সংগ্রামী মানুষের প্রতিরোধ। জীবনের নঞর্থকতা তাঁর কাছে বড় হয়ে ওঠেনি। সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সরাসরি রাজনীতিই হয়ে ওঠে কবিতার বিষয়। 'দীক্ষিতের গান' কবিতায় লিখছেন,

পালাবার পথে ধুলো ওড়ানোর দঙ্গলে, ভাই

আমিও ছিলাম একজন, আজ প্রাণপণে তাই

ভীরুতার মুখে লাথি মেরে লালঝাণ্ডা ওঠাই ।...

হতাশার কালো চক্রান্তকে ব্যর্থ করার

শপথ আমার; মৃত্যুর সাথে একটি কড়ার

আত্মদানের; স্বপ্ন একটি পৃথিবী গড়ার।

সমস্ত ভীরুতা, আত্মঅপমানের জবাবে বুঝি মানুষ নিজেই নেয় আত্মদানের শপথ। 'ঘোষণা' কবিতায় কবি বলেছেন ,

মৃত্যুকীর্ণ পথে হই জড়ো;

নতুন জন্মের ডঙ্কা বাজে;

বেদনায় পৃথ্বী থরো থরো।

এদেশ আমার গর্ব

এ মাটি আমার চোখে সোনা।

আমি করি তারি জন্মবৃত্তান্ত ঘোষণা।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কলমে উঠে আসে পূর্বতন কবিদের ভাবনা। রবীন্দ্রনাথ 'বধূ' কবিতায় বলেছিলেন,

বেলা যে পড়ে এল, জলকে চল

পুরনো সেই সুরে কে যেন ডাকে দূরে –

কোথা সে ছায়া সখী, কোথা সে জল।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ও বললেন 'বধূ'র কথা --

গলির মোড়ে বেলা যে পড়ে এল

পুরনো সুর ফেরিওলার ডাকে,

দূরে বেতার বিছায় কোন মায়া

গ্যাসের আলো-জ্বালা এ দিনশেষে।

কাছেই পথে জলের কলে, সখা

কলসি কাঁখে চলছি মৃদু চালে

হঠাৎ গ্রাম হৃদয়ে দিল হানা

পড়ল মনে, খাসা জীবন সেথা।

বেশ বোঝা যায়, বিশ্বযুদ্ধোত্তর শহরের বধূর কাছে দীঘির অতল জল নেই, আছে গলির মোড়ে কলের জল। 'পাষাণ-কায়া রাজধানী'তে সে পথও বুঝি নিষ্কন্টক নয়, লাঠিধারী পেশোয়ারীর ভয়ে কখনো দ্বারে খিল তুলতে হয়, কখনো মনে হয় 'লেকের কোলে মরণ যেন ভালো !'

বিশ্বযুদ্ধ কেড়ে নিয়েছে আমাদের আবেগ, নষ্ট করে দিয়েছে মানুষের সুকুমার বৃত্তিগুলিকে। কবি সুকান্ত অঙ্গীকার করেছিলেন 'এ পৃথিবীকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাবো আমি'। কিন্তু কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় অনুভব করেছেন এই পৃথিবী এখনও বুঝি বাসযোগ্য হয়ে ওঠেনি স্বপ্নভঙ্গকারী আততায়ীর নিষ্ঠুরতায়। তাই 'উজ্জীবন' কবিতায় বলছেন,

যে

ফুটন্ত একটি স্পর্শাতুর হৃদয়

উত্তেজনায় আর অসহ্য বেদনায় ছিন্নভিন্ন ক'রে

একটি কিশোরের আশ্চর্য কণ্ঠের কাকলি স্তব্ধ করে দিয়ে

মাটির বুকে টেনে আনে এক ঝলক রক্ত,

তারপর সমস্ত শরীর জুড়ে শাদা কাপড় বিছিয়ে

মৃত্যুর গুণকীর্তন করে –

সুকান্ত, তোমার সেই আততায়ীকে

পৃথিবীর বুক থেকে মুছে দিয়ে

তোমাকে বাঁচাবো।

রাজনৈতিক কর্মী এবং কবি এই মেলবন্ধনে সুভাষ মুখোপাধ্যায় ছিলেন পরম্পরাহীন সম্পূর্ণ একক এক কবি। প্রথম জীবনে পার্টির কাগজের সাংবাদিকতার সূত্রে তুলে নিয়েছিলেন মানুষের মুখের ভাষা। রিপোর্টাজ তৈরির সেই ধারাই গড়ে তুলেছিল তাঁর গদ্যরচনার ভিত। কাব্যগ্রন্থের পাশাপাশি 'আমার বাংলা', 'যেখানে যখন', 'যেতে যেতে দেখা', 'টো টো কোম্পানি' প্রভৃতি গদ্যগ্রন্থ তাঁর অনন্য প্রতিভার স্বাক্ষর। বলা যায়, এই গদ্যের ভিত থেকেই জন্ম নিয়েছিল তাঁর গদ্য-কবিতার ভাষা। কবিতার স্বাদ এবং ছন্দের জাদুকরী বিন্দুমাত্র লঘু না করেও কবিতার মধ্যে এনেছিলেন দৈনন্দিন কথোপকথনের আটপৌরে সহজতা। 'ফুল ফুটুক না ফুটুক' কবিতায় বলছেন 'এক কালোকুচ্ছিত আইবুড়ো মেয়ে'র কথা যে 'গায়ে হলুদ দেওয়া বিকেলে' 'রেলিঙে বুক চেপে ধরে' শহরের পথে হারিয়ে যাওয়া হরবোলা ছেলেটির কথা ভাবে

ঠিক সেই সময়

চোখের মাথা খেয়ে গায়ে উড়ে এসে বসল

আ মরণ! পোড়ারমুখ লক্ষ্মীছাড়া প্রজাপতি!

তারপর দড়াম করে দরজা বন্ধ হবার শব্দ,

অন্ধকারে মুখ চাপা দিয়ে

দড়িপাকানো সেই গাছ

তখনও হাসছে।

মুখের ভাষার সাবলীলতায় কবিতা এবং গদ্যের কঠিন সীমারেখা কখন যেন মুছে যায় নিজেরই অজান্তে। তাঁর কবিতার বিষয় গড়ে উঠেছিল রাজনৈতিক বিশ্বাসের নির্দিষ্ট তত্ত্বের ভিত্তিতে, কিন্তু জীবনকে তিনি দেখেছিলেন তত্ত্বের বাইরে। তাই বুঝি তৈরি হয় 'মিছিলের মুখ', 'আমার কাজ', 'বত্রিশ সিংহাসন', 'মুখুজ্যের সঙ্গে আলাপ', 'আশ্চর্য কলম' জাতীয় গদ্যগন্ধী আশ্চর্য সব কবিতা। তুর্কি কবি নাজিম হিকমতের কবিতার অনুবাদের অভিজ্ঞতাতেই বুঝি আরো বৈচিত্র্যময় হয়েছিল তাঁর কবিতার ভাষা। কবিতার অবয়বে তিনি ধরেছিলেন মুখের লাবণ্যময় ভাষাকে, ধরেছিলেন ঘরোয়া ভাষাকে। তাঁর কবিতার বাঁধুনিতে ছন্দ ছিল কিন্তু সে ছন্দও এত অনায়াস গতির যে ছন্দ যে আছে তাও যেন বোঝা যায় না কখনো কখনো। কিছু কবিতা উদাহরণ হিসেবে পড়া যেতে পারে। 'মেজাজ' কবিতায় দেখি শাশুড়ি 'কালো অলক্ষুণে, পায়ে খুরওয়ালা ধিঙ্গী' বউমার মেজাজের রহস্য ধরতে না পেরে ছেলে-বউয়ের ঘরে আড়ি পেতেছেন। শাশুড়ি শুনলেন

বউ বলছেঃ 'একটা সুখবর আছে'।

পরের কথাগুলো এত আস্তে যে শোনা গেল না।

খানিক পরে চকাস চকাস শব্দ।

মা হয়ে আর দাঁড়াতে লজ্জা করছিল।

কিন্তু তদন্তটা শেষ হওয়া দরকার –

বউয়ের গলা ; মা কান খাড়া করলেন।

বলছেঃ 'দেখো, ঠিক আমার মত কালো হবে।'

এরপর একটা ঠাস করে শব্দ হওয়া উচিত।

ওমা, বউমা বেশ ডগমগ হয়ে বলছেঃ

'কী নাম দেব, জানো?

আফ্রিকা।

কালো মানুষেরা কী কাণ্ডই না করছে সেখানে'।

কবিতার নাম 'আশ্চর্য কলম' –

এই যে দাদা, এতদিনে বেরিয়েছে –

নতুন ফরমুলায় তৈরি

খলিফাচাঁদের আশ্চর্য কলম ঃ খাই-খাই।

চোর, জোচ্চোর, লোচ্চা, লম্পট, খাজা, খোজা,

পণ্ডিত, মূর্খ, যে-কেউ চোখ বুজে

রাতারাতি লেখক হতে পারে।

এ কলম হাতে থাকলে

বসা বা দাঁড়ানো, চিৎ বা উপুড়

যে কোনো অবস্থায়

প্রকাশ্যে ঝোপ বুঝে কোপ দেওয়া যায়,

কোনোরকম তাগবাগ বা রাখঢাকের দরকার হয় না।....

দাম উত্তম মধ্যম হিসেবে।

সঙ্গে বিনামূল্যে চুন এবং কালি।

এ লাইনে

যদি কোন ভদ্রলোকের আবশ্যক হয়

বলবেন।

রাজনীতির পাশাপাশি অরাজনৈতিক সাধারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বরূপ ফুটে ওঠে কবির শাণিত কলমের বিদ্রূপে।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সৃজনীশক্তির অন্যতম প্রকাশ তাঁর সৃষ্ট অনুবাদসাহিত্য। নাজিম হিকমতের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হয় ১৯৫৮ সালে তাসখন্দ শহরে অনুষ্ঠিত আফ্রো-এশীয় সম্মেলনে। এই সাক্ষাৎ ছাপ ফেলে গভীরভাবে। অন্য ভাষার সাহিত্যই তো পারে সেই ভাষার সমাজ বা মানুষের সাথে পরিচয় ঘটাতে। তাই তাঁর হাতে পাই একে একে নাজিম হিকমত, হাফিজ, পাবলো নেরুদা, চর্যাপদ, অমরুশতকের কবিতার অনুবাদ, রোজেনবার্গ পত্রগুচ্ছ বা অ্যানা ফ্রাঙ্কের ডায়েরির মতো অনুবাদ। অনূদিত গদ্যের পাশে উজ্জ্বল তাঁর উপন্যাসগুলি, 'হাংরাস', 'কে কোথায় যায়', 'কমরেড কথা কও'।

আজীবন সাহিত্যব্রতী সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর কবিতার মধ্যেই বেঁচে থাকবেন। 'মে দিনের কবিতা, 'সালেমনের মা', 'ফুল ফুটুক না ফুটুক', 'কাল মধুমাস', 'ছেলে গেছে বনে', 'একটু পা চালিয়ে ভাই' প্রভৃতি কালজয়ী কাব্য-কবিতার স্রষ্টার মৃত্যু হয় না। পাঠকের নিবিড় হৃদয়ের ভালোবাসার পুরস্কার ছাড়াও পেয়েছেন 'সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার', 'আনন্দ পুরস্কার', 'সোভিয়েত ল্যান্ড পুরস্কার', বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত 'দেশিকোত্তম উপাধি', 'জ্ঞানপীঠ পুরস্কার' অর্থাৎ দেশ

বিদেশের নানা পুরস্কার।

পদাতিক কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় পথ চলেছেন রাজনীতিকে সঙ্গী করে আমৃত্যু। তাই বুঝি কবির আকাঙ্খা,

আমাকে কেউ কবি বলুক
আমি চাই না।
কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে
জীবনের শেষদিন পর্যন্ত
যেন আমি হেঁটে যাই।
আমি যেন আমার কলমটা
ট্রাক্টরের পাশে নামিয়ে রেখে বলতে পারি –
এই আমার ছুটি
ভাই, আমাকে একটু আগুন দাও।

ছুটি নিয়েছে সাধারণ মানুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমৃত্যু পথ চলা পদাতিক কবির কলম। সেই কলমেরই জোরে মেহনতী মানুষের ভালোবাসায়, অন্তরবিশ্বাসের অগ্নিপরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ কবি-কর্মী সুভাষ মুখোপাধ্যায় পেরিয়ে যাবেন শতসহস্র শতবার্ষিকী।।

সূত্র-সংকেত ঃ

১. *জীবনানন্দ দাশ /কবিতার কথা/সিগনেট প্রেস/ ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৩৯৭/ পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯৩*

২. *নিজস্ব প্রতিবেদন, আনন্দবাজার পত্রিকা, ৯ই জুলাই, ২০০৩*

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি ঃ

১. *সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা/ দে'জ পাবলিশিং / ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৯৮৯*

২. *সুভাষ মুখোপাধ্যায় / কবিতা সংগ্রহ ১ম খণ্ড / দে'জ পাবলিশিং / প্রথম সংস্করণ, ১৯৯২*

৩. *সুভাষ মুখোপাধ্যায় / কবিতাসংগ্রহ ৩য়, ৪র্থ খণ্ড / নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড / প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৩*

৪. *অশ্রুকুমার সিকদার / আধুনিক কবিতার দিগবলয় / অরুণা প্রকাশনী / ষষ্ঠ সংস্করণ, ২০০০*

৫. *সন্দীপ দত্ত (সম্পাদিত) / সুভাষ মুখোপাধ্যায় ঃ জীবন ও সাহিত্য / র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন / দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১১*

৬. *অশোককুমার মিশ্র / বাংলা কবিতার রূপরেখা / দে'জ পাবলিশিং / তৃতীয় সংস্করণ, ২০১৩*

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মৌরিফুল' গল্পের সুশীলা চরিত্র ঃ স্বভাব-নিহিত প্রকৃতির বিস্ময়

ড. মমতাজ বেগম

[**বিষয়-চুম্বক** ঃ- *বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকৃতির কবি, মানুষের কবি। খুব তুচ্ছ বিষয়কেও তিনি জীবন্ত করে তুলেছেন তাঁর বর্ণনার গুণে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মৌরিফুল' গল্পের সুশীলা চরিত্রটি মানবিকতা ও ব্যক্তিত্বের যুগ্ম গুণে অনবদ্য। প্রকৃতির নানা লীলাবৈচিত্রের মতই সুশীলার রহস্যময় হৃদয় উন্মোচন করেছেন লেখক। তার ভালো লাগা, মন্দলাগা, সহনশীলতা, অসহায়ত, মুখরতা, মুখুজ্যে পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক এই সমস্ত কিছুর জীবন-ভাঁজ মৌরিফুল ওরফে সুশীলার মধ্যে দিয়ে ব্যক্ত হয়েছে। মৌরিফুল ক্ষুদ্র হলেও আপন সৌন্দর্যে ও সৌরভে ভরপুর। দেবতার পূজার বেদিতে স্থান না হলেও বিশাল প্রকৃতির নিঃসীম আকাশের কোলে যে বিরাজ করে আপন সৌন্দর্যে, সুশীলা তার বিশ্বাসের জগৎ নিয়ে গুমরে ওঠা কান্নার মধ্যেও খুঁজে পেয়েছে তার নিজস্বতাকে। মৃত্যুর পূর্বক্ষণে তার একান্ত পরিতৃপ্তির নিবিড় তাতেই চরিত্রটি জীবন্ত।*

সূচক-শব্দ ঃ *বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মৌরিফুল, সুশীলা, প্রকৃতি, মানুষ, মুখুজ্যে পরিবার*]

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমরা প্রকৃতি ও মানুষের মেলবন্ধনের লেখক হিসাবে চিনি। গ্রাম্য জীবনযাত্রা ও প্রকৃতির কোলে ফুটে ওঠা ছোট ছোট বিষয়ই তাঁর গল্পের মূল অবলম্বন। তাঁর কথায় বলা যায় 'প্রকৃতির রাজ্যে মানুষের যেতে হয় একাকী, তবেই প্রকৃতির রানী অবগুণ্ঠন উন্মোচন করেন দর্শকের সামনে, নতুবা নয়।' প্রকৃতির রাজ্যে অন্যান্য অভিজাত ফুলের পাশে মৌরিফুল খুবই তুচ্ছ তার সৌন্দর্য ও ঘ্রাণ ভিন্ন রকম। এই ফুলের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সুশীলার নামকরণ করা আসলে মানব ও প্রকৃতির অনিবার্য বন্ধনটিকে শক্ত করা। লেখক মানুষের সঙ্গে মানুষের বন্ধনকে সুদৃঢ় করার জন্যই প্রতিনিয়ত ঘটে যাওয়া সংসারের তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। এর পাশাপাশি বাঙালীর রক্তমজ্জার সঙ্গে মিশে থাকা চিরকালীন লোকায়ত ভাবনা, কুসংস্কার, শিকড় বাকড়ের ধারণা প্রতিটি চরিত্রের মনোসামাজিক দিকটিকে স্পষ্ট করেছে। প্রকৃতির অন্তর্গূঢ় ব্যঞ্জনায় মানবতার সর্বজনীনতা মহিমাদীপ্ত হয়ে উঠেছে।

'মৌরিফুল' গল্পের বিষয় বা প্লট খুবই সাধারণ। এটি পরিবারজীবন কেন্দ্রিক চরিত্রনির্ভর গল্প। গল্পের সুশীলা ও মৌরিফুল একাকার হয়ে গেছে মানুষ ও প্রকৃতির যুগ্ম ভাবনায়। সমগ্র গল্পে সংসারের নানা চিত্র, সঙ্কট সমস্যা থাকলেও গল্পের শুরু ও শেষ প্রকৃতির বন্ধনে আবদ্ধ। গল্প শুরু হয়েছে --

''অন্ধকার তখনও ঠিক হয় নাই। মুখুজ্জে বাড়ির পিছনে বাঁশবাগানের জোনাকীর দল সাঁজ জ্বালিবার উপক্রম করিতেছিল। তাল- পুকুরের পাড়ে গাছের মাথায় বাদুড়ের দল কালো হইয়া ঝুলিতেছে, মাঠের ধারে বাঁশবাগানের পিছনটা সূর্যাস্তের শেষ আলোয় উজ্জ্বল। চারিদিকে বেশ কবিত্বপূর্ণ হইয়া আসিতেছে, এমন সময় মুখুজ্জেদের অন্দর-বাড়ি হইতে এক তুমুল কলরব আর হৈ চৈ উঠিল।'প্রকৃতি ও মাবনজীবন একাকার হয়ে গেছে এই উক্তিতে। বিশেষত গল্পের মূল চরিত্র সুশীলা দোষে গুণে যেন প্রকৃতির জীবন্ত নামাবলী হয়ে উঠেছে।

সুশীলা চরিত্রের দুটি দিক। একদিকে আছে কোমল প্রাণ মানবদরদী হৃদয় অন্যদিকে আছে ব্যক্তিত্ববোধে সমুন্নত জেদি ও একগুঁয়ে স্বভাবী। প্রকৃতি যেমন উদার হস্তে আমাদের জন্মক্ষণ থেকেই দিয়ে যাচ্ছে তেমনি কখনো কখনো রুদ্র রুক্ষ রূপ নিয়ে প্রতিশোধ নেয় মানুষের উপর, ভালো বউ হয়ে থাকার জন্য যে সহনশীলা গুণ থাকা দরকার ছিল তা তার কম থাকায়

Dr. Momotaj Begam, Associate Professor, Dept. of Bengali, Uluberia College, Howrah

পারিবারিক অশান্তি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায়।

বাঙালী মেয়েরা এক অচেনা অজানা পুরুষকে স্বামী হিসাবে মেনে নিয়ে সংসারের বা পরিবারের দাসীবৃত্তি করে। যুগ যুগ ধরে মেয়েরা কখনো ভালোবেসে কখনো অসহায়ভাবে তা মেনে নিয়েছে, কিন্তু স্বামী নামক পুরুষটির কাছে যখন গঞ্জনা, ভর্ৎসনা, উপেক্ষা ও অসম্মান লাভ করে তখন ভিতরের সমস্ত শক্তি প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সুশীলার কৃপণ শ্বশুর রামতনুর কাছে সেটাই অন্যায় এবং অপরাধ। স্বামীর কাছে সে কথা শোনে তার গলাবাজির জন্য আর শ্বশুর বলে -'কাজ যখন চলিয়া যাইতেছে তখন অনর্থক কাঠ কাটিবার লোক ডাকিয়া আনা-আনিলেই একটা টাকা খরচ তো। পুত্রবধূ বকিতেছে বকুক, কারণ বকুনি উহার স্বভাব। পরিবারের জন্য রান্না করতে যখন আপ্রাণ চেষ্টা করে কাঠুকুটো সংগ্রহ করে তখন কোনো প্রশংসা নেই অথচ ভাত না রাঁধলেই সমস্যা। সংসারে টিকে থাকার জন্য যে বন্ধনের প্রয়োজন ছিল সুশীলার তা ছিল না। প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে যে হার্দিক বন্ধনপৃথিবীকে সুন্দর করে তোলে তার অভাবের কারণেই প্রকৃতি আমাদের উপর প্রতিশোধ নেয়, সুশীলাও তাই। তার ব্যথার স্থান ছিল বিয়ের পর স্বামী কিশোরীলাল যেভাবে তাকে কাছে টেনে নিয়ে গল্প শোনাত আজ তা করে না বরং সুশীলাকে নানাভাবে দায়ী করে।এর ফলে সুশীলার অভিমান ও একগুঁয়েমি আরও বাড়ে।

প্রকৃতিকে বা প্রকৃতির অন্তর্গামী রহস্যকে যেমন খোলা চোখে দেখা বা বোঝা যায় না, তেমনি সুশীলার কার্যকলাপের রহস্যও বুঝে ওঠা কঠিন। তাই গল্পকার তার সম্পর্কে বলেছেন - ''অত্যন্ত আনাড়ি, কোন কাজই গুছাইয়া করিতে পারে না,অথচ দোষ দেখাইতে চাহিলে ক্ষেপিয়া যায়।'' প্রকৃতি যেমন আপন ছন্দে চলে সুশীলাও তাই। যখন ঝগড়া করে তখন আতুর আলির ম্যালেরিয়া রোগগ্রস্থ ছেলেটির প্রতি বিগলিত হয়ে একটা মোটা চাদর দান করে। এর ফলে তার মন শান্ত হয়। প্রকৃতি যেমন তার উদারতার মধ্যে দিয়েই নিজের ক্ষোভ ও যন্ত্রণার বহিঃপ্রকাশ ঘটায় ঠিক তেমনি। তার অন্তর্নিহিত স্বভাবের মধ্যে তা ছিল। এমন ঘটনার পরিচয় গল্পে আরও পাওয়া যায়, যখন শাশুড়ি বলে যাওয়া সত্ত্বেও সে রান্না করেনি কাঠের অভাবে অথচ রামলোচন মুখুজ্যের অসহায় পুত্রবধূ তেল ধার করতে এলে বাড়িতে থাকা সমস্ত তেল দিয়ে দেয় স্বতঃস্ফূর্তভাবে। প্রকৃতি যখন দেয় সেখানে কোনো কার্পণ্য করে না সুশীলার মধ্যেও কোনো কার্পণ্য নেই।

প্রকৃতি যেমন আনন্দ খুঁজে পায় তার প্রতি ভালবাসা ও যত্নে তেমনি সুশীলার ভালবাসা-বুভুক্ষ-মন আনন্দ পেয়েছিল উন্মুক্ত আকাশের নীচে নৌকাযাত্রার সময় চৌধুরীবাড়ির নবাগতা বউটির 'মৌরিফুল' সম্বোধনে। কেউ তাকে এমন করে ভালোবেসে কাছে টেনে নেয়নি বা আপন করেনি। তাই সুশীলা এমন ভালবাসায় মুগ্ধ ও অভিভূত হয়ে যায়। সুশীলা হারিয়ে যায় ভাবনার এক ভিন্ন লোকে। প্রকৃতিকে যেমন সকলে বুঝতে বা অনুভব করতে পারে না তেমনি সুশীলাকেও সকলে ঠিক বুঝতে পারে না। বাড়ির লোকেরা তাকে বোঝার চেষ্টাও করেনি। অথচ এই নবাগতা বউটি সুশীলার মধ্যে আবিষ্কার করে মৌরীফুলের স্নিগ্ধ সুবাস ও সৌন্দর্য।

শাশুড়ির কথায় শিবতলায় পুজো দিতে গিয়ে গোপনে স্বামী বশীকরণের ওষুধ এনে স্বামীকে খাওয়াতে গেলে মোক্ষদা দেখে ফেলে। মোক্ষদার কথাই সবাই বিশ্বাস করে যে সেটি বিষ। সকলে মিলে তাকে প্রবল শাস্তি দিলে সুশীলা মনে মনে 'মৌরীফুল' সম্বোধনের মোহে অন্য জগতে সময় কাটায়। পরদিন প্রবল জ্বর হয়, ভুল বকে এবং সন্ধ্যার আগেই মৃত্যু হয়। এভাবেই মানুষ প্রকৃতিকে না বুঝে তার উপর অকথ্য অত্যাচার করে। যার পরিণাম প্রকৃতির ধ্বংস। কিশোরীর দ্বিতীয় বউ সুখের সামগ্রী নিয়ে সংসারে এসেছিল। আধুনিক যুগের মানুষেরা যেমন প্রকৃতির সহজ অকৃত্রিম দানের পরিবর্তে গ্রহণ করছে তাৎক্ষাণিক সুখী উপকরণ। সুশীলা স্বামীকে ভালোবেসে আরও বেশী আপন করে নিতে চাইলে তার ফল যেমন উল্টো হয় তেমনি প্রকৃতি আমাদের মঙ্গলের জন্যই তার রূপ পরিবর্তন করে কিন্তু বুদ্ধিজীবী ক্ষণসুখে অভ্যস্ত মানুষ তা ভুল বুঝে তার উপর অত্যাচার করে। কখনো গাছ কেটে কখনো কলকারখানার বিষাক্ত ধোঁয়া ছেড়ে, কখনো জল, মৃত্তিকা দূষিত করে পরোক্ষে নিজেদের ক্ষতি করছে। সুখই অসুখের কারণ হয় কিন্তু শান্তি কখনই অশান্তির কারণ হয় না। সুশীলা তার উদার মন নিয়ে সকলকে আপন করে নিতে চাইলেও সংসারের লোকেরা তাকে আপন করে নিতে পারেনি।

মৌরীফুল ওরফে সুশীলা চরিত্রই এই গল্পের কেন্দ্রবিন্দু। তাকে ঘিরেই মুখুজ্যে পরিবারের মন মানসিকতা, সমস্যা, দ্বন্দ্ব প্রকাশিত হয়েছে। সুশীলা চরিত্রকে কেন্দ্রে করে এক ব্যঞ্জনাধর্মী পরিণাম আঁকাই লেখকের মুল লক্ষ্য। এই চরিত্রটির স্বরূপ অঙ্কণ করতে গিয়ে লেখক দুটি দিককে প্রকৃতির সঙ্গে একাকার করে দিয়েছেন। একটি তার নৌকায় বন্ধুত্ব হওয়া নববধুর মাধ্যমে সংকীর্ণ জায়গা থেকে উদার পরিবেশে যাওয়া, দ্বিতীয়টি মুখুজ্যে পরিবারে সুশীলার মৃত্যুর পর নববধূ মেঘলতার আগমনে সুশীলার স্মৃতি মুছে যাওয়া - 'সংসারের অলক্ষ্মীরূপা আগের পক্ষের বউ-এর নাম।' এতে মুখুজ্যে পরিবারের

নির্মমতা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে এর ফলে সুশীলা চরিত্র জীবন্ত রূপ পায়। প্রকৃতি সেই সৃষ্টির আদিলগ্ন থেকে আমাদের কত কিছুই দেয় কিন্তু আমাদের লোভী সুযোগসন্ধানী মন রূপের মোহে আকৃষ্ট হয়ে খুব তাড়াতাড়ি ভুলে যায়। প্রকৃতির উদার নিষ্পাপ সত্তার অফুরন্ত দানের কোনো মূল্যই আমরা দিই না। প্রকৃতির সেই বিস্ময়কে, নির্বাক সত্তাকে সুশীলা চরিত্রটির মধ্যে দিয়ে জীবন্ত ভাবে প্রকাশ করেছেন লেখক।

সুশীলা চরিত্র যেমন তার মৃত্যুকে হাসিমুখে বরণ করে নিতে পেরেছিল, তার সমস্ত যন্ত্রণাকে ভুলতে পেরেছিল নববধূর দেওয়া মৌরীফুল নামকরণকে মনে করে - 'জগতে কেউ তাহাকে ভালোবাসে না কেবল ভালোবাসে তাহার মৌরীফুল'। তেমনি ক্ষুদ্র মানুষও বৃহৎ মানুষের দিকে অগ্রসর হয় ভালবাসার মধ্যে দিয়েই। সাধারণ তুচ্ছ বিষয়কে প্রকৃতির পটভূমিতে রেখে কিভাবে অন্তর্গূঢ় ব্যঞ্জনায় মানবতাকে বিস্ময়কর ও সর্বজনীন করে তুলেছেন লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তা চরিত্রের বাস্তবতা ও রহস্যর মধ্যে দিয়ে দেখিয়েছেন। প্রকৃতি-মানবের বন্ধনকে, স্বভাবের বিস্ময়কে, রহস্যকে এমনভাবে এক রেখায় মিলিয়ে দিয়েছেন যা অনবদ্য। প্রকৃতি যেমন কঠোরে কোমলে গড়া সুশীলাও তেমনি। রুদ্রতা ও কোমলতার সহাবস্থানে আমরা যেমন প্রকৃতির রহস্যতে ধরতে পারি না তেমনি সুশীলাকেও চিনে উঠতে পারি না। সমালোচক বীরেন্দ্র দত্ত বলেছেন - 'সুশীলার ব্যক্তিত্বের স্বভাবে আছে সেই পারিবারিক সমস্ত রকম ন্যায়-অন্যায় বোধ থেকে চরিত্রটির উদাসীন, নিস্পৃহ এক মানস ক্রিয়া। সুশীলার শ্বশুরের সঙ্গে দুর্বিনীত আচরণ, শাশুড়ির উৎপীড়নের প্রবলতম প্রতিপক্ষ হওয়া, স্বামী কিশোরীর সঙ্গে মান-অভিমান সবই সুশীলার চরিত্র ন্যায়ে মেলে না। সে সংসারে থেকেও এক স্বার্থশূন্য' সংসার বিবিক্ত মন নিয়ে দিন কাটানোয় বেশী উৎসাহী অবচেতন মনে।' ঠিক প্রকৃতি যেমন নির্বাক থেকে তার কর্মচঞ্চলতার মধ্যে দিয়ে বুঝিয়ে দেয় তার ভাললাগা মন্দলাগার বিষয়কে।

সুশীলা প্রকৃতির মতই সহজ সরল নিষ্পাপ ও উদার। প্রকৃতি যেমন তার প্রতিবাদ কাজে কর্মে দেখাতে পারলেও স্থান পরিবর্তন করে অন্যত্র গিয়ে বাঁচতে পারে না তেমন সুশীলার অসহায়তা। সমস্ত অত্যাচার অবহেলা সহ্য করেও মৃত্যুর দিন পর্যন্ত সেই স্থানে জীবন কাটাতে হয়েছে। মৌরীফুল ভাবনাকে নিয়ে মনে মনে এক ভালবাসার বিস্ময়ের জগৎ তৈরি করলেও কেউ তার ঠিকানা পায়নি, পেতেও চায়নি, এই ঠিকানা পেয়েছিল চৌধুরী বাড়িতে আগত কলকাতার নববধূ-''সুশীলার সুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া সে যেন মুগ্ধ হইয়া গেল, রং যদিও ততটা ফর্সা নয়, কিন্তু কালোর উপর অত শ্রী সে কখনো দেখে নাই। নদীর ধারের সরস সতেজ চিক্কণ শ্যাম কলমী-লতারই মত একটা সবুজ লাবণ্য যেন সারা মুখখানায় মাখানো।''

প্রকৃতিকে বা তার সৌন্দর্যকে দেখার যেমন সহৃদয় চোখ থাকা প্রয়োজন তেমনি ভাবেই সুশীলাকে চেনার-জানার দেখার চোখ সবার ছিল না। সকলের কাছ থেকে অবহেলা সহ্য করা সুশীলার চোখেও জল এসে যায় নববধূর মিষ্টি কথায় -

''পাড়াগাঁয়ে এসে তোমায় কুড়িয়ে পেলাম তোমায় কখনো ভুলবো না। সুশীলার চোখে জল আসিল, এত মিষ্টি কথা তাহাকে কে বলে? সে কেবল শুনিয়া আসিতেছে সে দুষ্ট, একগুঁয়ে, ঝগড়াটে।'' খারাপ কথা আমাদের কারোরই ভালো লাগে না, ভালো কথায় মুগ্ধ হই। সুশীলা অকপটে যেমন তার মায়ের দেওয়া আংটি দিয়েছিল নববধূকে তেমনি নববধূও সুশীলাকে নিজের মায়ের পেটের বোনের সঙ্গে তুলনা করেছিল। 'মৌরীফুল' নামের ব্যঞ্জনার মধ্যে দিয়ে প্রকৃতিস্বভাব চিহ্নিত সুশীলার চরিত্র রহস্য জীবন্ত রূপ পায়। সুশীলার বর্তমান জীবন থেকে তাকে উদার প্রশস্ত প্রকৃতির বুকে বিস্তারিত করে দিয়েছেন লেখক।

'মৌরীফুল' ক্ষুদ্র হলেও আপন সৌন্দর্যে ভরপুর। দেবতার পূজার বেদিতে তার স্থান হয় না কিন্তু বিশাল নিঃসীম আকাশের কোলে সে বিরাজ করে আপন সৌন্দর্য নিয়ে। সে আপনাতে আপনি বিকশিত। সাংসারিক লাভ লোকসানের হিসাবে অথবা বাণিজ্যিক মূল্যে কিংবা আভিজাত্যের ফুলদানিতে তার জায়গা নেই কিন্তু প্রকৃতি রাজ্যের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য বিকাশে তার দান যথেষ্ট। সুশীলা চরিত্রের স্বরূপ অনুসন্ধানে লেখক এক স্মৃতিসুখকর প্রকৃতির রূপ অঙ্কণ করেছেন -

''রাত্রের জ্যোৎস্না ক্রমে আরও ফুটিল। তখন চৈত্রমাসের মাঝামাঝি, দিনে তখন নতুন-কচি পাতা-ওঠা গাছের মাথার উপর উদাস অলস বসন্ত-মধ্যাহ্ন ধোঁয়া ধোঁয়া রৌদ্রের উত্তরীয় উড়াইয়া উড়াইয়া বেড়ায় ... দীর্ঘ দীর্ঘ দিনগুলি প্রস্ফুট-প্রসূন-সুরভির মধ্য দিয়া চলিয়া নদীর ধারে শিমুলতলায় সন্ধ্যার কোণে গিয়া ঢলিয়া পড়ে ... পাড়াগাঁয়ের আমবনে বাঁশবনে জ্যোৎস্না-ভরা বাসাতে সারারাত কত কি পাখির আনন্দ কাকলী ... বসন্ত-লক্ষ্মী প্রথম প্রহরের আরতির শেষে বনের গাছপালা তখন আবার নূতন করিয়া টাটকা ফুলের ডালি সাজাইতেছে। জানালার বাহিরে জ্যোৎস্নায় ওগুলো কি ভাসিতেছে? সেই যে তাহার স্বামী গল্প করিত জ্যোৎস্না রাতে পরীরা সব খেলা করিয়া বেড়ায়, তাহারা নয় তো?''

এ প্রশ্ন শুধু সুশীলার নয়। সমগ্র মানব সমাজের। অন্ধকার থেকে আলো নিঙড়ে নিয়ে হৃদয় সাজাবার চেষ্টা সকলের, কিন্তু কেউ নিতে পারে কেউ পারে না। প্রকৃতিকে দেখার চোখ সকলের থাকে না, তেমনি সুশীলা চরিত্রের অন্তর্নিহিত রহস্যের স্বরূপ অনুসন্ধান করতে পারেনি তার পরিবারের লোক। তাই তার মৃত্যু খুব নিরাসক্ত ভাবে হয়- 'সন্ধ্যার কিছু পূর্বে সে মারা গেল'। এত প্রতিকূল পরিবেশে জল-হাওয়া-মাটি বিহীন অবস্থায় অকালে শুকিয়ে গেল একটা তরতাজা প্রাণ।

মৌরী যেমন কষায় মিষ্টিতে এক বিচিত্র স্বাদে ভরপুর– সুশীলা চরিত্রেও কষা মিষ্টির সমন্বয় আছে। সে তার মত করে স্বাভাবিকভাবে বাঁচতে পারেনি। অন্যের চাওয়া পাওয়ার মত বাঁচাকেও মেনে নিতে না পেরে বিদায় নিতে হয়েছে প্রকৃতি রাজ্য থেকে। সুযোগসন্ধানী, হিসেবী মানুষের কাছে মৌরীফুলের কোনো অস্তিত্ব না থাকলেও প্রকৃতিরাজ্যকে সে ভরিয়ে দেয় নীরব সৌন্দর্যে। তাই নববধূর কথাবার্তা তার দেওয়া মৌরীফুল নাম সুশীলার মধ্যে তৈরী করেছিল এক বিশ্বাস্য জগতের, যা তার একান্ত আপন সেখানে কেউ হস্তক্ষেপ করে না। মৃত্যুর পূর্বক্ষণে এই একান্ত পরিতৃপ্তির নিবিড় ব্যঞ্জনা সুশীলার স্বভাবের মধ্যেই ছিল। সর্বকালীন প্রকৃতি রহস্যের দ্যোতক হয়ে পাঠকের মনকে এক গুমরে ওঠা ব্যথায় ভরিয়ে দিয়েছে। প্রেম ভালবাসাহীন অত্যাচারিত নশ্বর শরীরটা প্রাণহীন হয়ে পড়ে থেকেছে প্রকৃতির কোলে। কিন্তু সুযোগসন্ধানী মানুষেরা খুব সহজেই মেঘমালাকে এনে সেই স্থান পূর্ণ করেছে। তাদের কাছে সুশীলা কোনো বিস্ময় না হয়ে বিস্মৃত হয়েছে। 'তুচ্ছ অতিতুচ্ছ বিষয়কে ছোটগল্পে নিয়তই রসোত্তীর্ণ করে তোলার শিল্পকৌশল, মৌরীফুল গল্পেও ফুটে উঠেছে সুশীলা চরিত্রের মধ্যে দিয়ে।

গ্রন্থপঞ্জিঃ

আকর গ্রন্থঃ

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ গল্পসমগ্র (প্রথম খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা.লি., কলকাতা

সহায়ক গ্রন্থঃ

বীরেন্দ্র দত্ত, বাংলা ছোটগল্পঃ প্রসঙ্গত প্রকরণ, পুস্তক বিপনি, কলকাতা, ৭০০ ২০১

শ্রাবণী পাল সম্পাদিত, বাংলা ছোটগল্প পর্যালোচনাঃ বিশ শতক, অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৬

Section III

Man in Relation to Others:
Human Relationship As Viewed by Jean Paul Sartre.

Dr. Aditi Bhattacharya

[Abstract: *This article tries to explore Jean Paul Sartre's exposition of problem of man's relationship with others as depicted in his Being and Nothingness. As a free being, i.e. in his project-oriented striving, man cannot live an isolated life and all his actions have a reference to other members of his stature. Sartre tries to find out how does man as a free person can meet another free human being and how they interact. He raises the question whether the existence of other constitutes a threat to man's freedom. In this respect he refers to the thoughts of Husserl, Hegel and Heidegger regarding the problem of intersubjectivity. As against their approach to the problem Sartre has made a direct approach to the problem on concrete level by analyzing some basic human relationships. He has tried to show how man, as an egoistic self, struggles to be united with the other self.*

Keywords: *Being-for-others; Self-consciousness; Subjectivity; Engaged freedom; Being-as-object; Conflict*.**]**

In one of his famous plays 'No Exit' Jean Paul Sartre has declared " hell is other people".
This dramatic declaration gives a clue to the Sartrean thought regarding intersubjectivity during the first phase of his philosophical career. It was the period when he has just completed his philosophical book **Being and Nothingness**. Here I would like to concentrate on Sartre's analysis of intersubjectivity in **Being and Nothingness**.

In dealing with the problem of man's relation with others Sartre has pointed out it is an accepted fact that man is placed in a situation where there are other human beings—it is a part of his 'facticity' (a given fact of his existence) that he has to deal with others and in his dealing with others he realises that he is responsible for all his actions as they have a direct reference to other/s. No wonder that the existence of other/s presents a complicated question before man: Does this constitute a threat to man's freedom?

Sartre thinks that underlying the problem of the existence of others there is a fundamental presupposition. It is presupposed that other is not 'me', other is a 'self' different from 'myself'. Here it is evident that 'negation' is the 'constitutive structure of the being-for- others'. I am related to the other by the relation of negation. Sartre points out that most realist and idealist philosophers have viewed this negation as an external negation. The other as a physical body or

Dr. Aditi Bhattacharya, Associate Professor, Dept. of Philosophy, Uluberia College, Howrah

as an objective system of mental representations is revealed to me in space – there is always a real or ideal space existing between her/him and mine which externally separates her/him from me. The only way by which we encounter each other is through knowledge. Thus, according to them, the interaction is possible between two beings only on the epistemological level. But Sartre observes that the relation between me and the other cannot be a relation of external negation. If I am merely externally separated from the other, the existence and non-existence of the other will have nothing to do with mine. But the fact is that it only by negating me the other is what she/he is and by negating her/him I am what I am. Hence there is a relation of internal negation between mine and her/him and it is because of this relation I in a way am determined by her/him and she/he is by me.

Some philosophers of nineteenth and 20th centuries have realised that human beings are internally related. But Sartre points out that they have tried to find the connection between two consciousnesses within the structure of the consciousness and in doing so they have also committed the error of establishing relation among human beings in the sphere of knowledge. Sartre first discusses Husserl's Philosophy as a victim to this error. In his **Cartesian Meditation** and in **Formal and Transcendental Logic** Edmund Husserl claims that the reference to the other is indispensable for the constitution of the world where my consciousness in confronting the objective world encounters other selves. In my solitude when I consider a particular tree or hill, the others will always instil into there with all the meanings they attach upon things which I consider and thus they also constitute the meaning of the tree or the hill. Other's existence is as certain as the objects of the world and there is no reason to hold that my ego has a special privilege to another ego in constituting the world. The other, whom I encounter in my experience, is not an empirical being because, Husserl thinks, as pure consciousness or transcendental subject we escape one another and the only relation that can be established among us is on the level of meaning. So Sartre tells us: "Because Husserl has reduced beings to a series of meanings, the only connection he has been able to establish between my being and that of the other is a connection of knowledge."[2] Sartre next considers Hegel who, he thinks, has shown a greater brilliance than Husserl in dealing with the problem of other. Hegel holds that the existence of other is not indispensable for the constitution of the world but for the very constitution of my consciousness as self- consciousness. In his **Phenomenology of Mind** Hegel has told us that my consciousness becomes self-conscious only in relation to other. In order to become conscious of myself I must have to realise the truth that I am 'me' by virtue of the fact that I am not 'other'. I, by my very being, exclude the other just as the other excludes mine. No person can remain satisfied unless she/he secures acknowledgment from the other and this search for recognition in the other ultimately gives birth to the struggle from which there arises the famous 'Master- slave' relation. In this relation the Master by virtue of his power dominates over the slave who constitutes the truth for the former because it is only in relation to the slave the Master gains and retains his

position as Master.

But Hegel, according to Sartre, has committed the same error of measuring 'being' by help of knowledge. He speaks of the conflict of consciousnesses not on the level of 'being' but on the level of 'truth' and " this truth can be attained only in so far as my consciousness becomes an object for the other at the same time as the other becomes an object for my consciousness..... knowledge here is still the measure of being and Hegel does not even conceive of the possibility of a being for others which is not finally reducible to a being as object." [3] Hegel thinks that in my self-consciousness I can recognize myself in other and the other's self (what she/he is for her/him) in me; similarly the other in her/his self- consciousness can recognize herself/himself in me and myself (what I am for mine) in her/him. But Sartre points out that this sort of recognition is sheer impossibility. It is not possible for me to apprehend 'myself' in her/him, i.e. to apprehend me as an object for her/him as a subject; neither it is possible for me to apprehend the other in her/his true being, i.e. in her/his subjectivity. Similarly, the other (for whom I am merely an object) cannot know herself/himself in me, i.e. she/he cannot know her/him as an object for me, neither can she/he knows my true being as subjectivity in her/his self- consciousness.

The difficulties of treating the problem of others on epistemological level have been compensated by Martin Heidegger's attempt to treat the problem on ontological level. Heidegger realises that my relation with the other should be established on the level of being. In **Sein and Zeit** by introducing his famous concept of 'mit-sein', he tells us that human reality is 'being-with'. One of the mode of man's 'being-in-the-world' is his' being-with- others'. Man is so constituted that the being-with-others exists as a mode of his very being. As 'being-with' constitutes an ontological truth for man's existence, my consciousness is not related with the other as 'I' and 'you'—the only relation that exists is a 'we' relation. But Sartre thinks this ontological a-priori co-existence with others is universal in its approach and so fails to give an account of the concrete empirical relationship existing among human beings. It cannot provide the empirical practical foundation of my friendship with Peter or Annie. The relation of 'being-with' is completely useless in accounting for the psychological and social problems existing in the concrete level of human existence. Being dissatisfied with all the accounts of man's relation with others given by his predecessors, Sartre in his Being and Nothingness has taken a new approach to the whole issue. Sartre points out that in my inner being I must be assured not only of the fact that the other exists but also of the fact that the other is 'not me'. We are related to one another by an internal negation. The other neither exists merely as an object of my knowledge nor does she/he exists as a-priori constituent of my being – she/he is a being who takes interest in me ontically; she/he can establish relation with me on concrete ground. Sartre has a brilliant intuition to see that the other with whom I can establish concrete personal relations must be a real existing subject. In Being and Nothingness Sartre has introduced the phenomenon of 'look' which he thinks can directly represent before me the other as a 'subject', a 'presence in person'. From my everyday experience I

find that when another man makes her/his appearance in my perceptual field, my relationship with the objects in the field immediately changes. Before the entrance of the other person all the objects of the place existed only in relation to me. But as soon as another person appears she/he steals the perceptual field from me – the objects, which previously existed for me alone, now exist also for this person. I suddenly realise that this person is now enjoying the same scene I am enjoying and to my dismay I find that I can in no way apprehend the nature of her/his enjoyment – I cannot enjoy in the way she/he enjoys the scene. The other who thus decentralizes the situation which was previously centralized by my consciousness, may now turn her/his 'look' upon me. The moment she/he looks at me my status as a 'perceiving subject' undergoes a drastic change – I become the 'object' of her/his perception: she/he looks at me just as she/he looks at the grass or trees. Before her/his 'look' I now become aware of my 'object status' and at the same time realise her/him as a 'subject', as a 'conscious ego'.Sartre says when I am caught by the look of the other I lose my subject status because she/he now characterizes me as 'something' and thus turns me into an object for him. Suppose, moved by curiosity I look through the keyhole of a closed door. I am alone and not at all aware of my own self as a 'peeping being'. Suddenly I hear a footstep behind me and find 'myself' being observed by someone else. Suddenly I become aware of me as an 'object' for other person. Sartre points out here I am aware of 'me as an object' through my unreflective consciousness. Generally, the 'self' exists as an object to the reflective consciousness, but now this awareness of 'me' is not a reflective awareness from my part because it is not a result of my reflective judgment upon me. It is the other who judges me and it is because of her/him, I in my unreflective consciousness, become aware of 'myself'. Truly speaking I have no knowledge of the 'self' which is thus revealed to me– it always remains out of the reach of my cognitive world because it is only for the other it exists as an object who by her/his 'look' catches me as 'something'. Sartre observes ".....originally the bond between my unreflective consciousness and my Ego, which is being looked at, is a bond not of knowing but of being".[4] I cannot reflectively 'know' my 'self' but I 'am' the 'self' for the other for whom I now exist as 'peeping being'. I am characterized here as a 'hateful object' who is spying through a keyhole and I feel ashamed.

However, when I am thus turned into an object before the other's look, I, with my horror, discover that now I am not the master of the situation – I am a mere slave. Now I am not a free person fraught with possibilities because in her/him I have discovered the death of all my possibilities. I am a mere inanimate entity characterized and levelled by another person. I am now a captive before her/his endless freedom and in my helplessness I find out that my freedom is engulfed by another freedom. Sartre here points out an important fact. It is true that in the presence of the other's look I appear to have a character like an inanimate object, yet I cannot be totally transformed into a 'being-in-itself, i.e. an inanimate being. Unlike an inanimate object I have the power to turn the other into an object by throwing a 'look' at her/him. Then she/he will lose her/his

subjectivity and will be reduced into a status of an object before my look. I can very well transcend her/his transcendence by my transcendence and can regain my status as a subject. Thus each of us can at any moment lose our status as a subject and can be turned into an object by becoming a 'being-for-the-other'.

Sartre thinks that 'being-for-others' constitutes a factual necessity for every man. My 'being- for-others', i.e. my 'me-as-object' is internally related with the existence of other as a subject. In so far as I experience my being as 'being-for-others' I cannot exclude the others from my 'life-world'. The same thing is true for the other. The other person's 'being–as-object' is internally related with the existence of me as a subject. There is a constant tug of war between one person's being and the being of the other - each of whom in order to become free from the grip of one another tries to enslave the other. That is why Sartre has declared: "Conflict is the original meaning of 'being-for-others".[5]

In his **Being and Nothingness** Sartre makes an attempt to analyse the nature of some basic relations existing among human beings with a view to show conflict as the main constituent of the whole pattern of all possible intersubjective relations. He first analyses the 'relation of love'. In love the lover wants to be united with her/his beloved as a free being with another free being. Neither the lover nor the beloved wants to enslave the other because in their enslavement they miss what they truly want from their beloved. But this longing for other's freedom in love is a longing for an *engaged freedom* – a freedom engaged by its own resolution to love. The lover demands that the freedom of the beloved will lose in her/him alone – both of them want to be the source of all values for the beloved, to be the 'whole world' surrounding whom must move all the free acts and decisions of the beloved. Thus the lover in loving her/his beloved is held captive by her/his own demand to be loved. This ideal of love, as per Sartre, contains within it the seeds of its own failure. Love fails because the unity of the two subjectivities is never made possible. In their attempt to love one another both the lover and the beloved makes the other the 'object' of her/his desire and thus deprive them from enjoying the true subjectivity of each other. Sartre thinks this happens only because of the insurmountable gulf existing between two beings. This reminds us the song of Vaisnava Sadhaka Chandidasa: '*Dunhu kore dunhu kande bichheda bhabia'.*

Sartre says because of this failure of love the lover takes a different approach. In order to enjoy the subjectivity of the beloved she/he wants to be completely absorbed by her/his beloved and thus agrees to live as a tool, i.e. object of the enjoyment for the beloved. This is a masochistic attitude in which the lover denies her/his subjectivity and engages herself/himself only in her/his 'being-as-object'. But masochism as a tool also fails because she/he can in no way grasp the other's apprehension of herself/himself as an object. The second attitude which one can take towards the other is, according to Sartre, the attitude of 'indifference'. In my indifference I choose to look at the other persons as mere objects surrounding me and deliberately refuse to believe in their 'living presence'. In my indifference I thus ignore their subjectivity. Nevertheless, I cannot

help escaping an inward apprehension of other's subjectivity for whom my 'self' exists as an object and hence there remains a perpetual uneasiness on my part. Human being's desire to capture other's freedom is reflected in the sexual desire - it is originally a desire to appropriate other as an 'incarnated consciousness. In the attempt at such appropriation the lover by using her/his body, wants to take possession of the other through the enjoyment of the beloved's body as 'flesh'. But she/he discovers that flesh has nothing but the property of an inanimate object and it is unable to represent to her/ him the beloved as an 'incarnated consciousness'. Once again the lover's project of possessing the 'self' of the beloved fails.

Thus all the basic human relationships are doomed to frustration. But Sartre has shown that there are certain circumstances where human beings feel to be united with one another. They sometimes experience a 'we-feeling' – it is a feeling which arises under a specific context. As for example when a road accident occurs and I find myself as one of the spectators of the horrible scene I may have a feeling, namely, 'we are looking at the man lying dead on the road'. This 'we-feeling' may not be necessarily experienced by all the spectators present there, it may occur to any individual among ourselves being party to any given situation of the above kind. He further shows that it is in relation to the world of manufactured objects the individuals experience their status as 'we-subject' and become aware of them as belonging to a subject-community. When I am engaged with some other persons in manufacturing something I apprehend myself to be engaged in 'we-subject'. Similarly, when I am using a public road or a subway of a railway station by sharing it with other users I feel that it is 'we' who are using the objects. Sartre here points out that in our experience of 'we-subject' we have a feeling of togetherness but it is a pure psychological subjective experience on the part of the individual – it is nothing but a symbol of an individual longing for a unity of transcendence. Hence we cannot take it as a basis of true intersubjective relationship.

Here we may refer to a curious observation made by Maurice Merleau Ponty in his famous book **Phenomenology of Perception**. Merleau Ponty points out that ".... the intersubjective world is problematical only for adults. The child lives in a world which he unhesitatingly believes accessible to all around him. He has no awareness of himself or of others as privatesubjectivities, nor does he suspect that all of us, himself included, are limited in one certain point of view of the world With the cogito begins that struggle between consciousnesses, each one of which, as Hegel says seeks the death of the other".[6] But Merleau Ponty observes that one particular cultural object, i.e. language, which plays a vital role in creating a scope for intersubjective relation. In our experience of dialogue a common ground is constituted between me and other person – it is through our dialogue our 'thoughts are interwoven into a single fabric'. When we discuss something ".....we are collaborators for each other in consummate reciprocity. Our perspectives merge into each other, and we co-exist through a common world. In the present dialogue, I am freed from myself, for the other's persons thoughts are certainly his; they are not of my making,

though I do grasp them the moment they come into being, or even anticipate them "[7]

From the above discussion it appears that whenever human beings want to interact with one another as conscious personal self or ego it always ends in failure. Sometimes through some activities like engaging ourselves in dialogue or undertaking a common project, sharing a national crisis, facing a sudden incident like accident etc we develop a sense of unity but this is not a true unity which we aspire. As egoistic individuals we have our desire, self-interest, power to possess, etc which spoil our every endeavour to be united with others. Hence Sartre has truly assessed that on the level of egoistic consciousness all attempts to develop true intersubjective relation remains unrealised

References :

1. Jean Paul Sartre, *No exit and other Plays*: New York, Vintage 1047
2. Jean Paul Sartre, *Being and Nothingness*, Methuen and Co. Ltd. 1977, page no. 235
3. Idid, page 238
4. Jean Paul Sartre, *Being and Nothingness,* Methuen and Co. Ltd. 1977, page no. 261
5. Sartre, *Being and Nothingness*, Methuen and Co. Ltd., 1977, page no. 364
6. M. Merleau Ponty, *Phenomenology of Perception*, Routledge & Kegan Paul Ltd. 1962, page no. 355
7. ibid, page no. 354

The Current Scenario of E-Commerce in India : An Analytical Study

Dr. Arup Kumar Sarkar

[Abstract *: The process of keeping and managing business and financial records through the application of computers and information technology is known as E -Commerce or E-Business. Through this we can transact any amount of fund from anywhere to other. Through this we may buy anything with the help of debit and credit cards on online mode. Billing to customers, tracing of payments received, payments to be made, tracing supplies needed, items produced, stored, shipped, and sold, etc are some examples of application of e commerce. The present study makes an attempt to know the current scenario of E- Commerce in India.*

Keywords*: E-commerce, B2B, B2C*]

1. INTRODUCTION

The process of keeping and managing business and financial records through the application of computers and information technology is known as E -Commerce or E-Business. Through this we can transact any amount of fund from anywhere to other. Through this we may buy anything with the help of debit and credit cards on online mode. Billing to customers, tracing of payments received, payments to be made, tracing supplies needed, items produced, stored, shipped, and sold, etc are some examples of application of e commerce. It is the process of doing business through online mode. It is the conduct of business activities by using the computer technology and electronic communication.

In E-Commerce, electronic communication and digital information processing technology is used to purchase and sell goods or services on the Web. The early form of e-commerce is EDI or Electronic Data Interchange. The entire business scenario is being changed due E-Commerce which is the powerful innovation of Internet and through the world it is spreading fast. In 1994, the introduction of the World Wide Web (WWW) made us feel the power of Internet as a global access.

It has become easier to make global relations with companies with the help of global network. From this we can make a prediction that the traditional economy of all the developed countries will become the digital economy in the coming days.

E-commerce is a combination of technological processes and strategies of business that promote the instantaneous exchange of information within and between organisations.

It builds strong relationship with buyers & makes it easier to attract new customer, it helps to get better customer responsiveness and open new markets on a universal scale.

Dr. Arup Kumar Sarkar, Assistant Professor, Dept. of Commerce, Uluberia College, Howrah

In E-commerce various communication technologies is applied to provide the automated exchange of business information with internal and external buyer, supplier and financial institution.

Over the last decade, the E-commerce business in India has seen an exponential growth. There are many factors behind this growth including fast adoption of technology by Indian buyers, huge enhancement in the number of internet users, new enabling technologies, innovative business models and different payment options offered by E-commerce companies.

1.1 IMPORTANCE OF E-COMMERCE

E-commerce improves the operating efficiency of the business companies and which in turn strengthen the value and service given to consumers and endow with a competitive edge over competitors.

These developments may provide more effective performance. To an organisation, the direct benefit of applying e-commerce are quality enhancement, better customer satisfaction, more effective decision making, cost minimization, more speedy and interaction on real time basis.

Using e-commerce it is possible to execute information in relation to the transaction between two or more with the help of interconnected networks.

From the business perspective it is possible to perform more transactions in a single day as less time is required to make each transaction. So, we can say that E-commerce will replace traditional commerce where each transaction needs more time and cost from both the parties involved in the transaction.

In comparison to traditional commerce method, E-commerce is the most cost effective method as in e-commerce, the cost for the middleperson to sell goods and services can be saved and distributed to the other aspects of the business.

For e-commerce, the total overheads required to run the business is significantly lower than the traditional commerce method.

In e-commerce, the respective website of the businesses can be accessed virtually from anywhere through the Internet. For this, E-commerce gives better connectivity for its potential customer and we know that to both the parties be it consumers or the companies, connectivity has an important role to play to make the business firm a successful one.

E-commerce eliminates the boundaries of geographical location and provides a platform to meet more potential customers across the world. It provides some benefits to the customers also. Customers can have benefits such as browsing of catalogues, comparison of product price, and sitting at home they can buy from abroad also.

1.2 RECENT TRENDS IN E-COMMERCE

Digital population as of January 2024 in India is 751.5 million. Active E-commerce penetration is 76.7%. top categories in online retailers in India includes Fashion, Mobiles and Tablets, Consumer Electronics, Books, Movie Tickets, Baby Products, Groceries, Food Takeaway/ Delivery, Home Furnishings, Jewelry, and many more. E-commerce brings the change in the lifestyle of Indian consumers by seeking convenience, comfort and variety.

1.3 SOCIETAL IMPACT

The introduction of e-commerce has affected the traditional way of online exchanges. A new market place and opportunities has been created by e-commerce which helps the reorganization of economic processes in a more efficient and effective manner. The open shape of the Internet and the low expenditure of using it allow the interconnection of new and existing information and communication know-how. It provides the businesses and customers a new and stronger information system and a medium of communication. E-commerce helps the consumers to search and consume more innovative, customized, differently distributed and exchanged goods and services.

The introduction of ecommerce has seen a remarkable effect on the traditional means of doing business. It helps the producers and consumers to come in a close contact and reduces many of the expenditures previously involved in the business.

It is evident that the supply industry will be beneficial from the use of e-commerce which includes those producing computers, networking equipment and the software necessary for the modern life. It has made an impact on the following fields of economic activity such as product pricing; product availability, patterns of transportation, costs of transactions, cost and profit configuration of all the businesses, behavioural pattern of consumers in developed economies and competition globally.

1.4 ECONOMIC AND BEHAVIOURAL CHANGES

In comparison to B2B ecommerce, B2C ecommerce has shown more significant effect on the economy and on consumers' behaviour.

In earlier days, when buyers wished to buy they had to fix time to shop during certain hours of the day, or they had to read through catalogs sent to them by mail-order houses.

Today, many buyers can simply use their computers and now smart phones or other portable electronic gadgets to make shopping through online mode.

Both the parties be it buyers or sellers who are involved in e-commerce retail trade are no longer constrained by catalog mailing lists, store hours or geographic marketing areas. 24 hours a day and seven days a week a consumer can have access to a variety of goods with a few simple clicks. Over the past decade, the features of retail ecommerce merchandise also have been changed in a significant manner. Few years ago the most common type of merchandise sold online was computer hardware. Today, diversified goods and services are available over internet. Even a customer can buy anything over internet. In many ways, the online customers have been benefitted such as reduced cost of searching, reduced consumer prices, reduced price dispersion for many products. But there is another truth that is significant reduces in the number of small companies who are not able to compete as they are not able to adopt e-commerce.

Businesses which are larger in size such as retail book outlets, new automobile dealerships, and travel agents, are better able to compete in this new market environment.

There has a major boost in residential parcel delivery services regarding the extremely rapid growth of e-commerce retail sales.

1.5 IMPACT OF E-COMMERCE IN DEMAND PATTERN

By the use of e-commerce, technology and globalization become interrelated and for this, the speed of connectivity between sellers and consumers are increasing day by day. As a result the transactions are also increasing.

Recently in past we witnessed turmoil in the financial markets and in some networks of supply chain. In such situation, while small market corrections are taking place, speeding up sales transactions can be a very positive attribute.

At the time of economic correction as we have witnessed during great recession or covid period, a speedy and quicker response to make transactions may have cascading effect on supply which will result in expansion or contraction in making order, producing products, shipping process, and also in inventory.

Before advent of e-commerce, it might have taken few years for events in one country to make any impact on another country's economy. Now, for speed in technology and communication process, the impact may be nearly instant. This may be called some of the negative side of growth of e-commerce. Supply chain managers should develop strategies for dealing with this kind of issues.

2. LITERATURE REVIEW

Bird, S. & Tapp, A. (2008) remarks that to achieve goals of behavioral change, especially with teenagers, social marketers could use “cool”. They trace the past of cool through to its recent role in utilization before discovering how business marketers follow the cool trends. With a focal point on teenagers, characteristically cool customers but also those most likely to cuddle risky behaviors, they take into consideration of the prospective and danger of using cool for social marketing. They conclude with a realistic conversation of how to use cool, and how to keep on touch with cool customers in a social marketing context.

Bhat (2012) explores various social media marketing techniques that are responsible for bringing about this revolution of web 2.0. This paper tries to relate one of the most popular web 2.0 phenomenons of that of blogging with other equally growing social-networking sites Facebook and Twitter usage. A study is conducted across four blog categories to determine the correlations between blog popularity (using a measure of page views), and their activity on social-networking sites viz Facebook and Twitter. As it is true with the growing influence of social media as a marketing medium, we find a positive correlation between blog popularity and activity on social media.

Cha, J. (2013) explores whether and how factors affecting shopping attitudes on social networking sites may differ according to product type. This research paper centers on two kinds of objects that social networking sites bear that is real and virtual. He reveals that shopping services have different target consumers and factors according to product type. According to him, some factors such as usefulness, ease of use, security, age, and fit are significant in establishing constructive approach toward shopping for real items. On the other side, social networking sites, experience, gender, ease of use and fit impact the attitudes for virtual items.

Basheer (2020) makes a study to know the current trends of e-commerce in India. After analysis some secondary data he concludes that e-commerce is emerging as an important tool to certify exploding growth of Indian economy. With a rapidly growing internet penetration e-commerce

consumer behaviour using questionnaires. The study's findings disclose that internet consumer trust and perceived risk have significant influences on their purchasing decisions. Security problems, consumer trust, and privacy concerns includes the key issues.

Salunkhe, S. J. (2023) makes an attempt to study of growth of E-Commerce business of India in Post Pandemic Era. The study is based on some secondary data collected from several secondary sources. Finally, this paper concludes that the e-commerce marketplaces or e-commerce companies are playing very vital role in during COVID-19 Pandemic and Post Pandemic era, it provides variety of products as per the choice of consumers or customers at cheap or low prices or discounted prices. Especially Amazon India, Flipkart, Snapdeal, Myntra, and some others is the major player in the online shopping platform and they are very popular in Indian consumers.

3. OBJECTIVE OF THE STUDY

The primary objective of the study is to make an analytical study on the current scenario of e-commerce in India. The primary objective is divided into the following secondary objectives:

1. To study the importance and contribution of e-commerce.
2. To understand the challenges of e-commerce in India.

4. DATA AND METHODOLOGY

This research is based on secondary data which is collected from several sources i.e. research articles, different secondary sources such as books, websites, publications from Ministry Of Commerce, Govt. of India and many others.

5. ANALYSIS AND FINDINGS

Table 1: Present Market segments of E-commerce

Category	Specification
Digital population as of January 2024	751.5 million
E-commerce market size by 2030	350 Billion USD
Active E-commerce penetration	76.7%
E-commerce share in retail by 2024	10.7%
Share of online shoppers who prefer mobile wallets	55%
Category of online retail with the highest penetration rate	Clothing
Flipkart revenue	560 Billion INR
Most popular e-payment service	Paytm

Source: Secondary

From the above table we can see the present market segments of E-Commerce. As of January 2024, the digital population in India is 751.5 million. It is expected that by 2030, the e-commerce market size in India will be 350 Billion USD. Active e-commerce penetration in India up to 2023 is 76.7%. By 2024, e-commerce share in retail will be 10.7%. Up to 2023, share of online shoppers who prefer mobile wallets are 55%. Category of online retail with the highest penetration rate is clothing. Up to 2023, the revenue of Flipkart is 560 Billion INR. Most popular

e-payment service in India is Paytm followed by others. (Table 1)

Table 2: Number of internet users in India from 2019 to 2024 with a forecast until 2025

Year	No of internet Users
2019	525 Million
2020	564.5 Million
2021	601 Million
2022	634 Million
2023	660 Million
2024	751.5 Million
2025 (expected)	900 Million

Source: As table 1

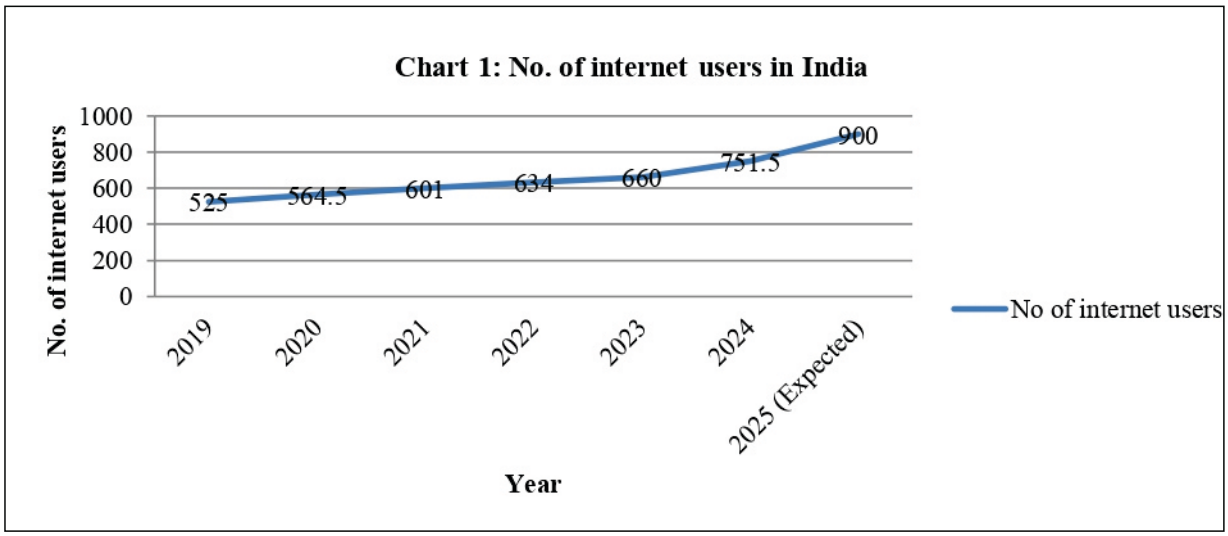

Source: As table 1

The above table depicts the number of internet users in India from 2019 to 2024 with a forecast until 2025. From the table we can see that in 2019, the no. of internet users are 525 million, in 2020 it is 564.5 million, in 2021 it is 601 million, in 2022, 2023, and in 2024, the number of internet users are 634 million, 660 million and 751.5 million respectively. From the data we can see that there has a significantly increasing trend in the number of internet users in India and it is expected that the number of internet users will be 900 million in 2025. (Table 2)

Table 3: Digital buyers in India from 2019 to 2024 with a forecast until 2025

Year	No of Digital Buyers
2019	273.6 Million
2020	289 Million
2021	298 Million
2022	312.7 Million
2023	330 Million
2024	350 Million
2025 (expected)	378 Million

Source: As table 1

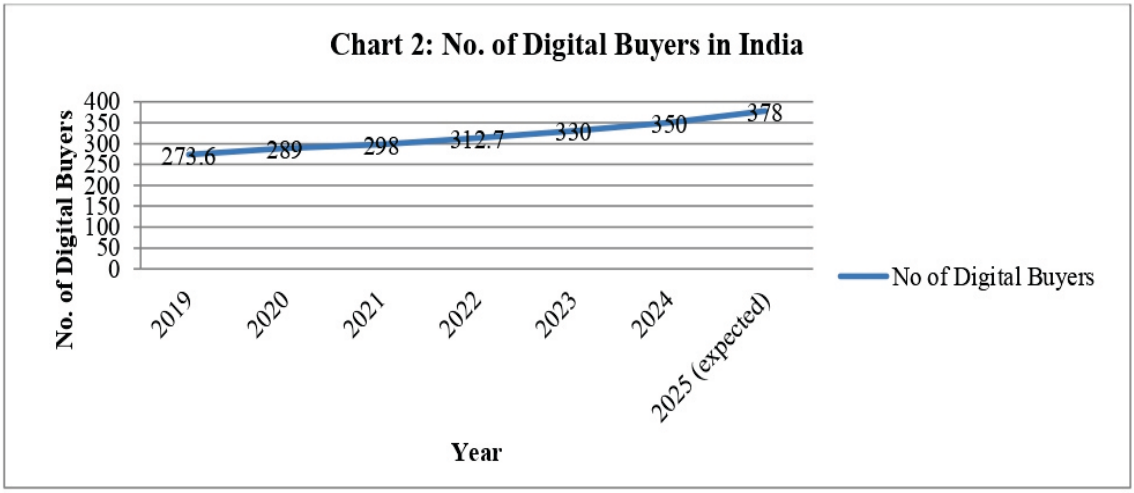

Source: As table 1

The above table depicts the number of digital buyers in India from 2019 to 2024 with a forecast until 2025. From the table we can see that in 2019, the no. of digital buyers are 273.6 million, in 2020 it is 289 million, in 2021 it is 298 million, in 2022, 2023, and in 2024, the number of internet users are 312.7 million, 330 million and 350 million respectively. From the data we can see that there has a significantly increasing trend in the number of digital buyers in India and it is expected that the number of digital buyers will be 378 million in 2025. (Table 3)

Table 4: E-Commerce sales in India (In Billion Dollars)

Year	E-commerce sales (In Billion Dollars)
2019	31.19
2020	38.09
2021	67.00
2022	83.00
2023	99.00
2024	110.00
2025 (expected)	145.00

Source: As table 1

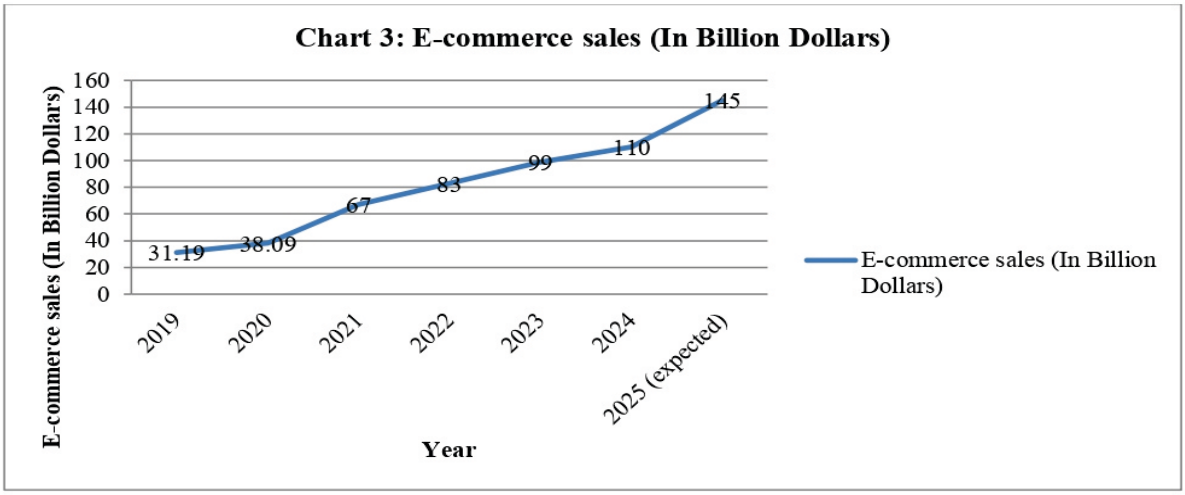

Source: As table 1

The above table depicts the E-commerce sales in India from 2019 to 2024 with a forecast until 2025. From the table we can see that in 2019, the E-commerce sales are 31.19 (in Billion Dollars), in 2020 it is 38.09 (in Billion Dollars), in 2021 it is 67.00 (in Billion Dollars), in 2022, 2023, and in 2024, the E-commerce sales are 83.00 (in Billion Dollars), 99.00 (in Billion Dollars) and 110.00 (in Billion Dollars) respectively. From the data we can see that there has a significantly increasing trend in the E-commerce sales in India and it is expected that the E-commerce sales will be 145.00 (in Billion Dollars) in 2025. (Table 4)

6. CHALLENGES OF E-COMMERCE IN INDIA

Though there has a significant increasing trend in e-commerce in India but till now there has some issues such as Taxation, Fraud, and Cyber security, Competition, Cash on Delivery, Infrastructure, Digital literacy and financial awareness for which e-commerce in India faces some challenges in their activities.

6.1 TAXATION

Before implementation of Goods and Service Tax, there was no uniform tax structure across different states and there was no clarity for categories the offerings would be treated as Goods or Services. Still there has some need of clear definition regarding taxation on some transactions such as e-wallet, cash on delivery, gift coupons, etc.

6.2 FRAUD

With the increase of e-commerce, there has also the rising trend of occurrence of supply of counterfeit products through the platform of e-commerce. This is the cause of anguish for both the parties be it the suppliers or the consumers. Till now we have to think about advent of any reliable mechanism by which we can measure the authenticity of the sellers and their products.

6.3 CYBER SECURITY

Through e-commerce the companies deal with huge database. Sometimes those are personal as well as confidential in nature. So cyber security or data security is one of the major challenges to the service provider. Otherwise these may be exploited by third parties or external entities.

6.4 PAYMENT METHOD

Cash on Delivery is another challenge to the sellers selling products on e-commerce. It makes the procedure laborious, more risk involved in it, and for the companies it is more expensive as the requirement of more working capital and freezing of capital is involved in it. In comparison to online payment, in cash on delivery, the percentage of returning of products is higher.

6.5 INFRASTRUCTURE

There is a significant rising trend in e-commerce in India. But still there has a lack of adequate infrastructural development especially regarding information technology and internet facilities in India.

6.6 DIGITAL LITERACY

Another major challenge in e-commerce is the digital literacy. Percentage of fraud can be reduced and percentage of e-commerce can be increased to a significant level if we are able to

enhance the level of digital literacy in India through several digital literacy increasing programmes and workshops.

6.7 FINANCIAL AWARENESS

Awareness regarding financial issues is a bigger challenge for the success of e-commerce. We have to make several policies to improve the financial awareness and financial inclusion.

7. CONCLUDING REMARKS

From the data we can see that there has a significantly increasing trend in the number of internet users, digital buyers, and e-commerce sales in India and it is expected that the number of internet users, digital buyers, and e-commerce sales in India will be 900 million, 378 million, and 145.00 (in Billion Dollars) respectively in 2025. From the entire view of the industry trends, we may conclude that e-commerce is an emerging as well as an important tool to certify blowing upgrowth of Indian economy. If we can make proper investment to make sound infrastructural development and remove the challenges of e-commerce, there has a huge scope of making India a super power economy.

References :

1. Bhat, A. (2012). Blog Popularity and Activity on Social Media: An Exploratory Research, *Indian Journal of Marketing,* 42 (5), 10-18.
2. Bird, S. & Tapp, A. (2008). Social marketing and the meaning of cool, *Social Marketing Quarterly*, 14(1), 18-29.
3. Cha, J. (2013). Shopping on Social networking websites; Attitudes toward real versus virtual items, Journal of Interactive Advertising, 10 (1), 77-93.
4. Solomon, S., Lokesh, M., & Lamoriya, J. (2022). IMPACT OF E-COMMERCE PLATFORM ON CONSUMER'S MINDSET, *International Research Journal of Modernization in Engineering Technology and Science,* 4 (3), 601-608.
5. Basheer K. T. (2020). AN ANALYTICAL STUDY OF E-COMMERCE IN INDIA, *INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS*, 8 (7), 4733- 4741.
6. Salunkhe, S. J. (2023). A Study of Growth of E-Commerce Business of India in Post Pandemic Era: An Overview, *British Journal of Multidisciplinary and Advanced Studies: Business and Management Sciences*, 4(1), 1-11.
7. Sharma, K. (2020). E-Commerce Market in India After Covid-19 Pandemic, GAP GYAN A Global Journal of Social Sciences, III (IV), 54-57.
8. Annual Reports of MSME, Govt. of India.
9. RBI Bulletin.
10. www.statista.com
11. Wikipedia India

A Brief review on Vitamin A

Dr. Bireswar Mukherjee

[Abstract : *Vitamin A as such naturally occurs only in animal materials- meet, milk, eggs and the like. Plants contain no Vitamin A but contain its precursor, β-carotene. Humans and other animals need either Vitamin A or β-carotene. To combat vitamin A deficiency several countries in South America have passed laws that all sugar for home consumption be fortified with Vitamin A.*

Keywords : *Night blindness, effect on immune system, deficiency cause scurvy and xeropthalmia.***]**

INTRODUCTION

Vitamin A (called retinol in mammals) is a fat-soluble vitamin. Human ingest two types of vitamin A: provitamin A from plants and preformed vitamin A from animal source. It is related to growth and differentiation of the tissues. The main sources of preformed vitamin A or retinol are liver, whole milk, fish oil and egg. Vitamin A is present in many animal tissues and is readily absorbed from dietary sources in the terminal small intestine. Vitamin A is a constituent of visual pigment and maintains epithelium. Vitamin A deficiency occurs with the chronic consumption of diets that are deficient in both vitamin A and beta-carotene. Deficiency symptoms are night blindness and dryskin. Prolonged and severe vitamin A deficiency can produce total and irreversible blindness. Vitamin A deficiency is also common in areas like Southeast Asia, where polished rice, which lacks the Vitamin, is a major part of the diet. Animal sources of vitamin A include fish (richest source), shark and cod liver oil, animal liver, egg yolk, milk and colostrums. Plant sources include carrot, spinach, yellow corn and potato. Daily requirement for infant, children and adults is 400, 700 and 1000 μg. Food fortification is the most cost effective, long-term approach, while supplementation is considered to be the fastidious way to uplift vitamin A status.

FUNCTIONS

Vitamin A contributes for vision in dim light. Vitamin A maintains the integrity and normal

Dr. Bireswar Mukherjee, Associate Professor, Dept. of chemistry, Uluberia College, Howrah

functioning of glandular and epithelial tissues. It supports skeletal growth and acts as anti-infective agent. It protects against some epithelial cancer. Vitamin A is oxidized to retinal, or vitamin A aldehyde, which combines with opsin, a protein, to form rhodopsin, the light sensing pigment in the retina. Thus, the earliest symptom of vitamin A deficiency is night blindness. In addition, vitamin A is required to form and maintain epithelial surfaces through a mechanism that is still unknown.

Role in immune system

Vitamin A, along with certain carotenoids, enhances the activity of the immune system and helps in controlling infections and even malignancies. Vitamin A has strong effect on the immunity of the body. Vitamin A deficiency compromises the immune system, and can increase the risk of illness and death from diseases such as malaria and measles.

Antixerophthalmic activity

Vitamin A protects skin and mucous membranes (especially front of eye and lining of digestive and respiratory tracts). It is essential for regeneration of visual purple. Generally retinyl acetate and retinyl palmitate are used in different food products as fortificants against the vitamin A menace. Each year the deficiency of vitamin A in developing countries has identified as a serious nutritional handicap like blind.

DEFICIENCY DISEASE

The World Health Organization (WHO) estimates that as many as 140 million children, especially in Africa and Southeast Asia, suffer from vitamin A deficiency (VAD). Vitamin A deficiency is a worldwide nutritional problem especially in the developingcountries that afflicts severely the health of pregnant and lactating women, infants and children. It is considered a wide spread public health problem among preschool children in the developing countries.

Vitamin A deficiency causes follicular hyperkeratosis (that is, the development of keratin plugs in hair follicle's, as seen in scurvy and a xeropthalmia (that is, corneal dryness) that can progress to corneal ulcers and resultant blindness. Acute vitamin A intoxication has occurred in arctic explorers who ate polar bear livers. Chronic hypervitaminosis A usually occurs after enormously excessive vitamin A ingestion by food faddists or in the treatment of acne. Its features may include arthralgias, fatigue, night sweats, and headaches due to benign intracranial hypertension. Though harmless, excessive beta carotene ingestion makes yellow or orange. In distinction to the observation in cases of jaundice, the sclera remainswhite. Different strategies like food diversification, fortification and supplementation are helpful to cope with vitamin A deficiency.

Vitamin A has important function in the body. It is required for growth and bone development and to maintain the health of the skin and eye sight. Night blindness is the first symptom of vitamin A deficiency. Low levels of vitamin A may causevision problems (such as night

blindness) and permanent eye damage.

Acute toxicity

Changes in the epithelial tissues, these are the tissues that cover the external surface of the body. Headache, nausea and vomiting are examples of acute toxicity.

Chronic toxicity

Dry skin, cracking of lips and painful areas of bone are examples of chronictoxicity.

Diet

Vegetables are primary source of vitamin A. Vegetable containing carotene do not produce teratogenic or toxic effects. Ingestion of food containing beta-carotene maintains vitamin A level in the blood.

CONCLUSION

Vitamin A is an essential micronutrient for the normal body. Functioning of the visual system, growth and development, immunity and reproduction. This has been pointed out by nutritional survey of Pakistan 1970 and 1976. The serum levels of vitamin A indirectly reflect its the acute status in the body. A pilot study for the nutritional problems in Pakistan showed that majority of the children in the study group was suffering from vitamin A deficiency. A study was carried out to evaluate the chronic toxic effects of vitamin A. Vitamin A and beta-carotene supply of women with short birth intervals: a perception of eye health in schools in Pakistan. Study indicated that schoolchildren and their teachers had a good knowledge of eye health, but many of them had serious misconceptions for example, use of kohl, pilot study. The importance of beta-carotene as a source of vitamin A with special regard to pregnant and breastfeeding women.Kohl is an important source of lead and can reduce children's intelligence even a low blood level. Health education in schools must take into account children's existing knowledge of and misconceptions about various aspects of Vitamin.

References:

1) Organic Chemistry, Vol-II, I.LFinar (Chemistry of Vision).
2) Food Science, Norman N.Potter, Joseph H. Hotchkiss 5th edition, 2007
2) Different websites on Vitamin A.

Foraging Behavior of Indian Honey bee, *Apis cerana indica* (Hymenoptera-apidae) In Marigold Flowers in Howrah, India

Supriya Mondal

[Abstract: *A study was undertaken at Nalpur, Howrah district of West Bengal, India during 2021. The foraging behavior of Indian honey bee, Apis cerana indica was observed in unmanaged marigold (Genda) during January to February 2021. Maximum foraging activity of honey bee was observed during third week of January 2021 (2.72 bees/5min/plant) followed by second week of January 2021 (2.61 bees/5min/plant) and fourth week of January 2021 (2.27 bees/5min/plant) however the lowest population was recorded during third week of February 2021(0.98 bees/5min/plant). Similarly during the different hours of the day the maximum population of honey bees were recorded at 10.00-12.00 Noon (3.16 bees/5min/plant) followed by at 12.00-2.00PM (2.09 bees/5min/plant) and at 8.00- 10.00AM (1.09 bees/5min/plant) However the lowest population was recorded at 2.00-4.00PM (0.97 bees/5min/plant).*

Keywords: *Foraging behavior, Marigold, Indian honey bee, Apis cerana indica***]**

INTRODUCTION

Tagetes (marigold) is an important genus belonging to the Asteraceae family and consists at least of 56 species. It is a plant which is native to America, but it is naturalized in other countries in Africa, Asia, and Europe. *Tagetes* spp. can be cultivated as ornamental plants or can be found as wild species. There are many species of this genus, such as *T. minuta, T. erecta*, *T. patula*, and *T. tenuifolia* that are studied because of their application in the field of agriculture, where they exhibit fungicidal, bactericidal, and insecticidal activities, as well as anticancer properties, resulting in their exploitation as beverages and condiments in folk medicine. Marigolds remove nematodes from the soil and are very attractive for honey bees for nectars and pollens and other beneficial insects. Genda (*Targetes* spp.) is an erect, branched and hardy annual, usually growing about 60 cm high. Recently, commercial cultivation of marigold in India has risen to an estimated 13,000 hectares with annual production of 200,000 tons of flowers, the highest for any flowers grown in India. This increasing demand of growing *Tagetes* is not due to only religious or social purposes but for its valuable essential oil components.Marigold requires mild climate for good growth, development and flowering. It requires optimum temperature 18-20 °C. Temperature above 35 °C restricts its growth of the plant which leads in reduction in flower size and number. In severe winter, plants and flowers are damaged by frost.

In view of above, a study was conducted in an unmanaged Marigold field to study the foraging behavior of Indian honey bee in marigold flowers. Marigold plants take long times to complete

Supriya Mondal, SACT-1, Dept. of Zoology, Uluberia College, Howrah

its life cycle about 4-5 months. It provides to honey bees abundant quantity of pollen and nectar so honey bees visits this flowers during morning to evening.

MATERIALS AND METHODS

The study was undertaken at Nalpur, Howrah district of West Bengal, India during 2021. Nalpur is geographically located at 22.5298° N, 88.1865° E. The foraging behaviour of Indian honey bee, *Apis cerana indica* was observed in unmanaged marigold during January to February 2021. The population of above honey bee sp. was recorded at seven days intervals per 5min/plant. 50 plants were randomly selected and count the number of honey bees visiting by visually observation starting from 8.00 AM to 4.00 PM with a two hours intervals, its total population was recorded and at the end it was averaged.

RESULTS AND DISCUSSION

The result depicted in Table 1. that the population of Indian honey bee was recorded maximum foraging activity during third week of January 2021 (2.72 bees/5min/plant) during this period the population was recorded lowest at 8.00-10.00 AM (1.6 bees/5min/plant) and suddenly increased at 10.00-12.00 Noon (4.62 bees/5min/plant) and started declined at 12.00-2.00 PM (3.38 bees/5min/plant) and the lowest was recorded at 2.00-4.00 PM (1.30 bees/5min/Plant). followed by second week of January 2021 the average population was recorded (2.61 bees/5min/plant) at the initial of day hours at 8.00-10.00 AM (1.50 bees/5min/plant) and started increased at 10.00-12.00 Noon (4.50 bees/5min/plant) and suddenly decreased at 12.00-2.00 PM (3.35 bees/5min/plant) and lowest at 2.00-4.00 PM (1.1 bees/5min/plant). Fourth week of January 2021 (2.27 bees/5min/plant) during this week the population was recorded lowest at 8.00-10.00 AM (0.98 bees/5min/plant) and suddenly increased at 10.00-12.00 Noon (4.18 bees/5min/plant) but it was started decreased at 12.00-2.00 PM (2.32 bees/5min/plant) and (1.6 bees/5min/plant) at 2.00-4.00 PM. During the first week of February 2021 population was found at 8.00-10.00 AM (1.2 bees/5min/plant) suddenly increased at 10.00-12.00 Noon (3.18 bees/5min/plant) and started declined at 12.00-2.00 PM (1.90 bees/5min/plant) and lowest at 2.00-4.00 PM (0.98 bees/5min/plant) and total average was recorded (1.81 bees/5min/plant). During the second week of February 2021 population was observed at 8.00 - 10.00 AM (0.90 bees/5min/plant) and increased at 10.00-12.00 Noon (2.88 bees/5min/plant) and started declined at 12.00-2.00 PM (1.58 bees/5min/plant) and lowest at 2.00-4.00 PM (0.72bees/5min/plant) and average population was recorded 1.525 bees/5min/plant. During the third week of observation of February month minimum population was observed at 8.00 AM -10.00 AM (0.94 bees/5min/plant) and increased highest at 10.00-12.00 Noon (1.30 bees/5min/plant) and started declined at 12.00-2.00 PM (0.78 bees/5min/plant) and lowest at 2.00-4.00 PM (0.5 bees/5min/plant). The averaged population was recorded lowest of all the observation (0.78 bees/5min/plant).

Overall the population of honey bee was found highest at different hours of the day at 10.00-12.00 Noon (3.16 bees/5min/plant) followed by at 12.00-2.00 PM (2.09 bees/5min/plant) and at 8.00-10.00 AM (1.09 bees/5min/plant) however the lowest population was recorded at 2.00-4.00 PM (0.97 bees/5min/plant).

These findings are in agreement with the earlier workers Dalio (2013 and 2015) recorded the foraging behaviour of honey bee, *Apis cerana indica* on Parthenium and Trianthema, Painkra *et al* (2014) noticed the comparative foraging activity of honey bees on buckwheat crop. Fazal *et al* (2015) who recorded the foraging activity of Himalayan bee, *Apis cerana* on sunflower, Painkra

(2016) who observed the foraging activity of rock bee, *Apis dorsata* on lajwanti grass, Painkra and Shaw (2016) recorded the foraging activity of honey bees on niger flowers. Kumar and Singh (2016) noticed the foraging activity of bees on coriander flowers and Manhare et al (2017) observed the foraging activity of Indian honeybee on buckwheat. Painkra et al (2014 & 2014) recorded the foraging behavior of honey bees on niger flowers. Painkra (2018, 2019) observed the foraging activity of giant bee, *Apis dorsata* on *Ageratum conyzoides* and coriander flowers. Painkra and Kumaranag (2019) who were recorded the foraging activity of stingless bee in sunflower and in broccoli flowers.

Table 1: Foraging activity of honey bee on different hours of the day in marigold flowers Population of honey bee at Different Hours of the day.

Date of observation	8.00-10.00 AM	10.00-12.00 Noon	12.00-2.00 PM	2.00-4.00 PM	Total	Mean
07-01-2021 To 14-01-2021	1.5	4.5	3.35	1.1	10.5	2.613
14-01-2021 To 21-01-2021	1.6	4.62	3.38	1.3	10.9	2.725
21-01-2021 To 28-01-2021	0.98	4.18	2.32	1.6	9.08	2.27
28-01-2021 To 04-01-2021	1.2	3.18	1.9	0.98	7.26	1.815
04-01-2021 To 11-02-2021	0.9	2.88	1.58	0.72	6.08	1.52
11-02-2021 To 18-02-2021	0.94	1.5	1.32	0.62	4.38	1.095
18-02-2021 To 25-01-2021	0.56	1.3	0.78	0.5	3.14	0.785
Total	7.68	22.16	14.63	6.82		
Mean	1.09	3.16	2.09	0.97		

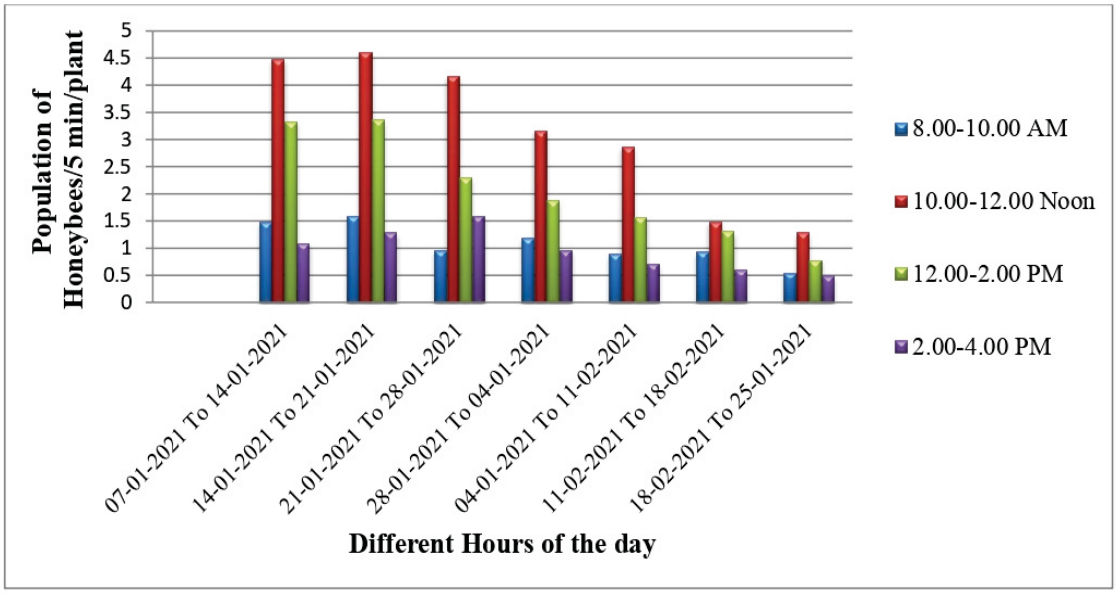

Fig. 1. : Showing the foraging activity of honey bee at different hours of the days.

Fig. 2. : Indian Honeybee foraging on marigold (morning time)

Fig. 3. : Indian Honeybee foraging on marigold (forenoon time)

Fig. 4. : Indian Honeybee foraging on marigold (afternoon time)

CONCLUSION

During the study of the foraging behavior of Indian honey bee, *Apis cerana indica* it was observed in *Tagetes* (Genda) during January to February 2021. Maximum foraging activity of honey bee was observed during third week of January 2021 (2.72 bees/5min/plant) followed by second week of January 2021 (2.61 bees/5min/plant) and fourth week of January 2021 (2.27 bees/5min/plant) however the lowest population was recorded during third week of February 2021 (0.98 bees/5min/plant). Similarly during the different hours of the day the maximum population of honey bees were recorded at 10.00-12.00 Noon (3.16 bees/5min/plant) followed by at 12.00-2.00PM (2.09 bees/5min/plant) and at 8.00-10.00AM (1.09 bees/5min/plant) However the lowest population was recorded at 2.00-4.00PM (0.97 bees/5min/plant). It is indicated that the afternoon and morning hours the activity of bees was recorded low as compared to noon however, the maximum was recorded during the forenoon because it was the availability of nectar rand pollen ample quantity.

References **:**

1. Dalio, J.S. (2013). Foraging activity of *Apis mellifera* on Parthenium hystophorus. Journal of Pharmacy and Biological Sciences 7(5) :01-04.
2. Dalio, J.S. (2015). Foraging behaviour of *Apis mellifera* on Trianthema portulacastrum. Journal of Entomology and Zoology Studies; 3 (2): 105-108.
3. Kumar, M. and Singh, R. (2016). Initiation- Cessation and Period of Foraging Activity of Honeybees on Coriander (*Coriandrum sativum* L.) flowers. Advances in Life Sciences. 5(23):11119-11121.
4. Manhare, J.S., Painkra, G.P., Painkra, K.L. and Bhagat, P.K. (2017). Studies on the forging activity of Indian honey bee, *Apis cerana indica* Fabr. and other honey bee spp. on buckwheat flowers. Journal of Plant Development Sciences. 9(8):823-828.
5. Painkra, G.P. and Shaw, S.S. (2016). Foraging behaviour of honey bees in niger flowers, *Guizotia abyssinica* Cass. in North Zone of Chhattisgarh. International Journal of Plant Protection. 9(1):100-106.
6. Painkra, G.P., Shrivastava, Shiv, K., Shaw, S.S. and Gupta, Rajeev (2014). Foraging behaviour of honey bees on niger flower (*Guizotia abyssinica* Cass.). An International Research Journal Lab to Land. 6(24):382-386.
7. Painkra, G.P., Shrivastava, Shiv, K., Shaw, S.S. and Gupta, Rajeev (2014). Foraging behaviour of honey bees on niger crop (*Guizotia abyssinica* Cass.). An International Research Journal Lab to Land. 6(23):289-293.
8. Painkra, G.P. (2018). Foraging behaviour of giant bees, *Apis dorsata* (Hymenoptera – Apidae) on Ageratum conyzoides in Northern hill Zone of Chhattisgarh. Journal of Plant Development Sciences. 10(9):517-520.

9. Painkra, G.P. (2016). Foraging behaviour of rock bees, *Apis dorsata* on lajwanti grass (*Mimosa pudica*) in Surguja of Chhattisgarh. Journal of Plant Development Sciences.; 8(11):543-545.
10. Painkra, G.P. (2019). Foraging behaviour of honey bees on coriander (*Coriandrum sativum* L.) flowers in Ambikapur of Chhattisgarh, Journal of Entomology and Zoology Studies , 7(1): 548-550.
11. Painkra, G.P., Bhagat, P.K. and Meshram, Y.K. (2014). Comparative foraging activity of honey bees visiting on buckwheat crop (*Fagopyrum esculantum*).Interface on Management of Ecofriendly Important Insects in India at Jawaharlal Nehru Krishi Vishwa Vidyalaya, Jabalpur (M.P) India,
12. Painkra, G.P. and Kumaranag, K.M. (2019). Foraging activity of stingless bee, *Tetragonula iridipennis* smith (Hymenoptera-Apidae-Meliponinae) in sunflower. Journal of Plant Development Sciences, 11(8) : 463-466.
13. Painkra, G.P. (2019). Foraging behaviour of stingless bee, *Tetragonula iridipennis* (Hymenoptera –Apidae) in broccoli flowers in Ambikapur of Chhattisgarh.Journal of Plant Development Sciences, 11(7) : 431-433.
14. Said, Fazal, Inayatullah, Mian, Ahmad, Sajjad, Iqbal, Toheed, Ali Shah, Ruidar, Usman, Amjad, Zaman, Maid and Ul Haq, Saeed (2015). Foraging behavior of the Himalayan honey bee, *Apis cerana* (Hymenoptera-Apidae) associated with sunflower, *Helianthus annus* L. at Peshwar district Khyber Pakhtunkhwa (KP) Journal of Entomology and Zoology Studies 3(3): 203-207.70